পশ্চিমবঙ্গ

বর্ষ ১৮ ।। সংখ্যা ২০ ।। ২৩ নভেম্বর ১৯৮৪ ।। ৭ অগ্রহায়ণ ১৩৯১







পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ ইলা কুণ্ডু

এডিট ঃ সুজিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com



ফটো : বিমল ঘোষ

মৌলালি যুব কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত সভায় ভাষণ দিচ্ছেন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী অধ্যাপক নির্মল বসু। তাঁর বামে শ্রী পান্নালাল মাজি এবং (বাঁ দিক থেকে) সমবায় মন্ত্রী শ্রী নীহার বসু ও শ্রী হরিদাস মুখোপাধ্যায়।

পশ্চিমবঙ্গ

২৩ নভেম্বর ১৯৮৪

গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

বছরে যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে। বার্ষিক চাঁদা সডাক ১০ টাকা।
ষাণ্মাসিক সডাক ৫ টাকা।

পাঠকদের প্রতি

পশ্চিমবংগ পত্রিকা প্রসংগে চিঠিপত্র লেখার সময়ের জবাবের জন্য চিঠির সংগে স্ট্যাম্প বা পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব পত্রের উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারি চিঠিপত্রের সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।

প্রধান সম্পাদক
প্রীতীন্দ্র কৃষ্ণ ভট্টাচার্য
সম্পাদকঃ ধীরেন্দ্র দত্ত

প্রতি সংখ্যার দাম ২৫ পয়সা

মনি অর্ডারে টাকা পাঠাবার ঠিকানাঃ

তথ্য অধিকর্তা
পশ্চিমবংগ সরকার
২৩ আর এন মুখার্জি রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০১

সম্পাদকীয় দপ্তরঃ
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবংগ সরকার

বিষয় সূচি

প্রচ্ছদঃ সারকারিয়া কমিশনের সমক্ষে রাজ্য সরকারের বক্তব্য রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু, বামে অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্র এবং ডাইনে মুখ্য সচিব শ্রী এস. ডি. কৃষ্ণাণ

আলোকচিত্রঃ অজিত দাস

অলংকরণঃ সমরেশ মুখার্জি

পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য সরকারের সাপ্তাহিক মুখপত্র

বর্ষ ১৮ ।। সংখ্যা ২০ ।। ২৩ নভেম্বর ১৯৮৪ ।। ৭ অগ্রহায়ণ ১৩৯১

সারকারিয়া কমিশনের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি

ভারতের ঐক্য ও সংহতিরক্ষার পক্ষে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

—মুখ্যমন্ত্রী

সাম্প্রতিক কালে দেশের বিভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের বিষয়টি এই মুহূর্তে সঠিকভাবে নির্ধারিত না হলে সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্তেজনা ও জাতীয় সংহতি বিরোধী মনোভাব বহুগুণে বেড়ে যেতে পারে। ভারতের ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য বৈচিত্র্যের কাঠামোর মধ্যে এদেশের ঐক্য ও সংহতিরক্ষার পক্ষে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কেরও প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক-অর্থনৈতিক-ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনের তাগিদে এবং সমৃদ্ধ জীবন গড়ে তুলতে কেন্দ্ররাজ্য সম্পর্কের সার্বিক বিন্যাস একান্তই প্রয়োজনীয়।

২১ নভেম্বর ১৯৮৪ কলকাতায় সারকারিয়া কমিশনের কাছে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের প্রশ্নে বিবৃতি দান কালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু একথা বলেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রী বসু রাজ্যের ক্ষমতা খর্ব করার কম প্রয়াস সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, স্বাধীনতার পরে যে সংবিধান রচিত হল তা যুক্তরাষ্ট্রীয় বলে অভিহিত হলেও চরিত্রের দিক থেকে তা প্রধানত ছিল একরাষ্ট্রিক। এই সংবিধানে রাজ্যগুলির স্বায়ত্তশাসন খর্ব করে কেন্দ্রের হাতে অনেক বেশি ক্ষমতা তুলে দেওয়া হল। সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর ঝোঁকটা হল রাজ্যগুলির ক্ষমতার ওপর আরও বেশি হস্তক্ষেপ করার। কিন্তু কেন্দ্রের ভূমিকা হওয়া উচিত সমন্বয়মূলক। পরিকল্পনা, দ্রব্যমূল্য, নির্দিষ্ট করা, মজুরি নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে কেন্দ্র শুধুমাত্র সমন্বয়-সাধনই করবেন না, উপরন্তু সাধারণ নির্দেশও দেবেন। পরিকল্পনা ও আর্থিক সমন্বয়ের ব্যাপারে অবশ্য কেন্দ্রকে উন্নয়ন পরিষদ নির্ধারিত সাধারণ নির্দেশক নীতির সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রাখতে হবে। এই পরিষদে কেন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যগুলিরও প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত। বিভিন্ন রাজ্যের মানুষের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়, তবেই একমাত্র শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ে উঠবে। আমরা শক্তিশালী রাজ্যের সপক্ষে, কিন্তু তাই বলে কোনোভাবেই কেন্দ্রকে দুর্বল করতে চাই না। কেন্দ্র ও রাজ্যের স্ব স্ব অধিকারের এক্তিয়ার যদি সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত করে দেওয়া যায়, তবে শক্তিশালী রাজ্যের ধারণার সঙ্গে শক্তিশালী কেন্দ্রের ধারণার বিরোধিতার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

সরকারি কাজে মাতৃভাষার ব্যবহার প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অষ্টম তফসিলে বর্ণিত ভাষাগুলি কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে সকল স্তরে সরকারি কাজে ব্যবহার করতে দিতে হবে। ভারতের যে কোনো নাগরিকের অধিকার থাকবে সরকারের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত যে



ছবি: অরিজিৎ ভট্টাচার্য

১৪ নভেম্বর ১৯৮৪ মহাকরণে সারকারিয়া কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি শ্রী আর এস সারকারিয়া ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু।

(শেষাংশ ৪৫৫ পৃষ্ঠায়)

সরকারি বিজ্ঞপ্তি ও ঘোষণা

রাজ্য সরকারের ঘোষণা :

নিহত শিখ পরিবার পিছু ১০ হাজার টাকা ও সম্পত্তি ক্ষতির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ

শ্রীমতী গান্ধী হত্যার পরে এ রাজ্যে হাঙ্গামায় নিহত দশ ব্যক্তির পরিবারবর্গকে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারি হারে দশ হাজার টাকা করে সাহায্য দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ ছাড়া পুলিশের গুলিতে নিহত চার ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি থানায় সমাজবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ না থাকে তাহলে তাঁদের পরিবারবর্গও সরকারি সাহায্য পাবে। ১৭ই নভেম্বর ৮৪ তারিখে রাজ্যের মুখ্যসচিব এস ভি কৃষ্ণণ মহাকরণে সাংবাদিকদের এ কথা জানান।

তিনি জানান, নিহতদের ক্ষতিপূরণ দেবার কোনও কেন্দ্রীয় সরকারি নির্দেশ সেদিন পর্যন্ত আসে নি। রাজ্য সরকার নিজেই এই টাকা দেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন।

মুখ্যসচিব জানান, সাম্প্রতিক গন্ডগোল যাঁদের সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে তারা সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ পাবেন বলে ব্যাংকগুলির সঙ্গে কথা হয়েছে। শুক্রবার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এক সারকুলার আসে রাজ্য সরকারের কাছে। সেই সারকুলার পেয়ে সেদিনই মুখ্যসচিব সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

বৈঠকে স্থির হয়েছে জেলা স্তরে জেলা শাসকরা এবং কলকাতায় পুলিশ কমিশনার ক্ষতিগ্রস্তদের আবেদনপত্রগুলি খতিয়ে দেখে ব্যাঙ্কের কাছে পাঠাবেন। শতকরা সাড়ে বার টাকা সুদে যোগ্য প্রার্থীদের ব্যাঙ্ক ঋণ দেওয়া হবে। এর জন্য কোনও জামিন লাগবে না, নিজেদের মার্জিন টাকাও দিতে হবে না। ক্ষতিগ্রস্তদের স্বল্পমেয়াদী ঋণ থাকলে সেগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণে পরিণত করার আবেদনও বিবেচনা করা হবে। ব্যাঙ্কগুলি বলেছে, আবেদনপত্র পাবার এক সপ্তাহের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরীক্ষার কাজ শেষ করে তাড়তাড়ি ঋণ দেবার ব্যবস্থা করা হবে। যাঁদের বাড়ি-ঘর, ব্যবসা ট্যাক্সী, গাড়ি, লরি স্কুটার ইত্যাদির ক্ষতি হয়েছে তাঁরাই এই সাহায্য পাবেন বলে মুখ্যসচিব জানান।

জেলাশাসকদের কাছে আবেদনপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। জেলা শাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীদের সব রকম সাহায্য করতে এবং ব্যাপারটা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাতে। শ্রী কৃষ্ণাণ জানান, শনিবার পর্যন্ত কলকাতা পুলিশ হাঙ্গামার সময়ে লুঠ হওয়া এক লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকার সম্পত্তি উদ্ধার করেছে। জেলাগুলি থেকে রাজ্য পুলিশ দুটি ট্রাক, একটি স্কুটার সহ চৌদ্দ লক্ষ টাকার জিনিসপত্র উদ্ধার করেছে। যথাযথ প্রমাণ ও জামিনের বদলে এসব জিনিস দাবিদারদের ইতিমধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

১৯৮৪-৮৫ খরিফ বৎসরের খাদ্য বন্টন ও সংগ্রহ নীতি

বন্টন নীতি: ১। খাদ্যশস্যের চাহিদার তুলনায় চাষযোগ্য জমি কম হওয়ায় এই রাজ্য বরাবরই একটি ঘাটতি রাজ্য।

সেই ঘাটতি পূরণ করার জন্য রাজ্য সরকার বরাবরই কেন্দ্রীয় ভান্ডার থেকে চাল ও গম নিয়ে তা রেশন দোকানের মাধ্যমে বন্টন করে রাজ্যের সরকারি বন্টন ব্যবস্থা বজায় রাখেন।

কেন্দ্রীয় ভান্ডার থেকে রাজ্য সরকার যা চাল, গম ও চিনি বর্তমানে পান তা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। এই সরবরাহ বাড়াতে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে বার বার অনুরোধ করে আসছেন। কিন্তু কোনও ফল পাওয়া যায়নি।

২। রাজ্য খাদ্যশস্য সংগ্রহ বেং সরকারি বন্টন ব্যবস্থার কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় তা দেখতে জিলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে খাদ্য ও সরবরাহ স্থায়ী সমিতি এবং পৌরসভাগুলিতে স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করার কাজ চলছে।

সংগ্রহনীতি: ১। এই রাজ্যে যে ধান ও চাল সংগ্রহ হয় রাজ্য সরকার তা কেন্দ্রীয় ভান্ডারে দিয়ে দেন।

২। এ বৎসর আমন ধান উৎপাদন ভাল হয়েছে এবং তার জন্য রাজ্য সরকার ধান ও চাল সংগ্রহের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছেন। এ বছর রাজ্য স্তরে ১ লক্ষ টন চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছে এবং প্রত্যেক জেলায় আলাদা আলাদাভাবে সংগ্রহের লক্ষ্য মাত্রা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। জিলা শাসকদের বলা হয়েছে যে, জেলা পরিষদের সভাধিপতিদের সঙ্গে পরামর্শ করে এই লক্ষ্যমাত্রা যাতে পূরণ হয় তার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে।

৩। রাজ্যে চালকলগুলির উৎপাদনের উপর ৪০ শতাংশ লেভি ধার্য হয়েছে তবে চালকলগুলি এই লেভির পরিবর্তে কনট্র্যাক্ট লেভি ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ চাল সরকারকে দেবার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

৪। গরীব চাষীদের যাতে অভাবে পড়ে সংগ্রহ মূল্যের কমে ধান চাল বিক্রী না করতে হয় তার জন্য ডি পি এজেন্ট নিয়োগ ও অন্যান্য ব্যবস্থা দ্রুত গ্রহণের ব্যাপারে জেলা কর্তৃপক্ষকে এবং ফুড কর্পোরেশনকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে বলা হয়েছে। এ ছাড়াও রাজ্য সরকারে তরফ থেকে যে সব জেলায় অভাবী ধান বিক্রী হবার সম্ভাবনা আছে সে সব জেলার পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে ধান সংগ্রহ করার জন্য মোট ১ কোটি টাকা ঋণ দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতি এই ধান সংগ্রহ মূল্যে ক্রয় করবেন এবং তা ফুড কর্পোরেশনের কাছে বিক্রী করবেন।

৫। ধান ও চালের সংগ্রহ মূল্য:	(প্রতি কুইন্টাল) ধান	চাল
ক) আউস ও বোরো	১৩০.৫০	২১০.১০
খ) সাধারণ	১৩৭.০০	২১৭.১০
গ) মিহি	১৪১.০০	২৯৫.৪০
ঘ) অতিমিহি	১৪৫.০০	২৩১.৪৫

ধান, চাল ক্রয় বিক্রয় ও চলাচলের উপর বিধিনিষেধ:

১। অন্যান্য বছরের মত এবারও শুধুমাত্র বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় ধান, চাল ও গম আনা ও নেওয়া ইত্যাদির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এবং রাজ্যের বাইরে ধান রপ্তানীর উপর এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকার ৮ কি.মি.-এর মধ্যে ধান ও চাল চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকছে।

২। এ ছাড়া অন্যান্য বছরের মত এ বছরও ধান, চাল, গম, গমজাত, দ্রব্য ইত্যাদির নিয়ে ব্যবসা ও মজুত সংক্রান্ত বিষয়ে লাইসেন্স পারমিট নেবার নিয়ম কানুন বহাল থাকছে। এই সম্বন্ধে সব নিয়ম কানুন যাতে কঠোর ভাবে প্রয়োগ করা হয় তার উপর নজর রাখতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে বলা হয়েছে।

৩। খাদ্য, বন্টন ও সংগ্রহ নীতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক পণ্য আইন এবং সংশ্লিষট আইনগুলি প্রয়োগ করার দিকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ

শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের সন্ধ্যাকালীন চাহিদা বর্তমানে ৬টা নাগাদ সবচেয়ে বেশি হচ্ছে এবং সন্ধ্যা ৫-৩০মি: থেকে ৬টা পর্যন্ত সি ই এস সি এবং ডব্লু বি এস ই বি উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যুৎ ঘাটতির পরিমাণ দারুণ বেড়ে গেছে।

শক্তি নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুযায়ী শিল্পক্ষেত্রে উচ্চশক্তি সম্পন্ন বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীরা সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ পাবেন না।

নতুন আদেশ নং ১৩৬৫-পাওয়ার (পি আর) তাং ১৪।১১।৮৪ বলে বিদ্যুতের সন্ধ্যাকালীন চাহিদার সময় সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১০টা থেকে এগিয়ে এনে সন্ধ্যা ৫-৩০মি: থেকে রাত ৯-৩০মি: করা হয়েছে।

সমবায় আন্দোলনের তাৎপর্য জনসাধারণের মধ্যে তুলে ধরতে হবে

— শ্রীনীহার বসু

সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমবায় সপ্তাহ উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে হল, সমবায় নেতৃবৃন্দ, কর্মী, সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য হল সমবায় নেতৃবৃন্দ, কর্মী, সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে সমবায় আন্দোলনের উন্নতি ও সমস্যা বিষয়ে আলোচনা করা ও জনসাধারণকে অবহিত রাখা। সম্প্রতি মৌলালি যুবকেন্দ্রে নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহের সূচনা করে পশ্চিমবঙ্গের সমবায় মন্ত্রী শ্রীনীহার বসু উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

এ বছর ৩১তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ পালন উপলক্ষে আয়োজিত এই সভায় শ্রী বসু তাঁর ভাষণে আরও বলেন, দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষিভিত্তিক-সেজন্য বর্তমানে এই ক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলনের বিস্তার কাম্য। ১৯৮২-৮৩ এবং ১৯৮৩-৮৪ যথাক্রমে ৩১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা ও ৩৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা কৃষি ঋণ বাবদ সমবায় মারফৎ দেওয়া হয়েছিল। ১৯৮২-৮৩ সালে দেয় ঋণের মাত্র ৩০.৩ শতাংশ আদায় হয়েছিল, ১৯৮৩-৮৪ সালে সে জায়গায় ৪১.০৩ শতাংশ ঋণ আদায় হয়েছে। ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে এই অগ্রগতি আশানুরূপ বলে মন্ত্রী মহোদয় জানান। পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম ও শহরাঞ্চলে ক্রেতা সমবায়ের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার উল্লেখ করে তিনি বলেন, সমবায় যতদিন না উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ততদিন ভোগ্যপণ্যের বিপণনের সঙ্গে যুক্ত থেকে এই প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের গুরু দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করতে পারবে না।

রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীনির্মল বসু বলেন, যদিও এদেশে সমবায় আন্দোলনের সূচনা ১৯০৪ সালে হয়েছে তবু সমবায়ের ক্ষেত্রে অগ্রগতি আশানরূপ হয়েছে তা বলা যায় না। সমবায় আন্দোলনের সার্থকতার জন্য সমবায় শিক্ষার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। প্রকৃত সমবায় শিক্ষা ছাড়া সমবায় আন্দোলন সাধারণ মানুষের মধ্যে দানা বাঁধতে পারেনা। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ মানুষের মধ্যে সমবায় চেতনা গড়ে তোলার দায়িত্ব রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন ও সহযোগী ২০টি জেলা সমবায় ইউনিয়নের উপর ন্যস্ত। মন্ত্রী মহোদয় আরও জানান, সমবায় ইউনিয়নগুলি সাধ্যমত দায়িত্ব পালন করছে। '৭৬-'৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে তন্তুবায় সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ১,২৯৯ এবং সভ্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১,৪৯১ টি; সভ্যসংখ্যাও বর্তমানে ৯১,৩০৩।

সভাপতির ভাষণে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় বলেন, সমবায় আন্দোলনের সার্থকতা নির্ভর করে সাধারণ মানুষের সমবায় চেতনার উপর। এই সমবায় চেতনা সৃষ্টির গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন ও জেলাস্তরে সহযোগী ২০টি সমবায় ইউনিয়নের উপর। এ ছাড়া, সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া সৃষ্টির জন্য ও সমবায় আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে সমীক্ষা ও প্রয়োজনীয় গবেষণার ব্যবস্থাও সমবায় ইউনিয়নগুলিকে করতে হয়। বর্তমানে সমবায় সমিতি ও সমবায় দপ্তরের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য রাজ্যে ছ'টি সমবায় শিক্ষণ কেন্দ্র আছে। অদূর ভবিষ্যতে উত্তরবঙ্গে আরো দুটি শিক্ষণকেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন আছে বলে শ্রী মুখোপাধ্যায় জানান।

জাতীয় মেধা অনুসন্ধান পরীক্ষার তারিখ বদল

অনিবার্য কারণে আগামী ১১।১১।৮৪ তারিখে নির্দ্ধারিত রাজ্য পর্যায়ের জাতীয় মেধা অনুসন্ধান পরীক্ষা স্থগিত রাখা হল। উক্ত পরীক্ষা আগামী ২।১২।৮৪ তে (রবিবার) পূর্ব নির্দিষ্ট কেন্দ্র সমূহে অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে যে সব প্রবেশ পত্র জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের (মাধ্যমিক শিক্ষা) মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে, সেগুলি ২।১২।৮৪ তারিখের পরীক্ষায় কার্যকরী হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংশ্লিষ্ট জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক শিক্ষা) এর দপ্তরে পাওয়া যাবে।

মৎস্যবীজ উন্নয়ন নিগমের অনুষ্ঠান স্থগিত

পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যবীজ উন্নয়ন নিগমের উদ্যোগে আগামী ১৭ নভেম্বর ১৯৮৪ বীরভূম জেলার কমলপুর মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান এবং ১৯ নভেম্বর মেদিনীপুর জেলার রামনগর, জলদা, নূতন জলদা, দাদন পাত্রবাড় এবং শংকরপুরে মৎস্য বিভাগের যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল তা আপাততঃ স্থগিত রাখা হয়েছে।



লোককবি নিবারণ পন্ডিত

মানিক সরকার

প্রতিভার জাদুস্পর্শে নিরস তথ্য যে সরল ভাষায় সরস গানে রূপান্তরিত হতে পারে, নিবারণ পন্ডিত তা প্রমাণ করেছেন। জারি গানের সুরে বারটি অনুচ্ছেদে 'নীলবিদ্রোহ' গানটির দুটি অনুচ্ছেদে তুলে ধরা যাকঃ

হায় হায়, রে–
প্রথম প্রথম সাহেবগুলি নীলের গাছ কিনিয়া,
নীল রং করিত তৈরি কুঠিতে আনিয়া।
অল্প দিনেই নীলের লাভে হইয়া লালে লাল,
স্থানে স্থানে বসায় কুঠি বিশাল বিশাল

ধুয়াঃ হারে ও নীলকরে করল সর্বনাশ।
ধনে প্রাণে চাষীকুল হইল বিনাশ।।

ভাই গো এই দ্যাশে আর থাকার উপায় নাই,
ইষ্টিকুটুম, ভাই বিরাদর রইল ঠাঁই ঠাঁই।
কার কাছে কই দুঃখের কথা, কার দিব দোহাই।

(তিন অনুচ্ছেদ)

অত্যাচারের ফলে চাষী ক্ষেপিয়া উঠিল,
জেলায় জেলায় চাষীরা সব জমায়েত হইল।
লক্ষ চাষী মিলিয়া করিল অঙ্গীকার।
স্মরণীয় সেই দিনটি ছিল শনিবার।

ধুয়াঃ হায় হায়রে ভীমরুলের হাঁড়ি
হাঁড়িতে ভাই ঢিল ছুইড্যাছে
পিছে পিছে আসছে ধাইয়া ঐ না ঝাঁকে ঝাঁকে,
পালাইবার পথ নাইরে আর, ঘিরিল চৌদ্দিকে।

(দশম অনুচ্ছেদ, লোক সংস্কৃতির রাজ্য উৎসব স্মারক পত্রিকা)

জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের দলিলরূপে 'খাদ্যের বদলে গুলি' শীর্ষক গানটি সমধিক পরিচিত। কোচবিহারে ১৯৫১ সনের ২১ এপ্রিল ক্ষুধার্ত নরনারীর উপর বেপরোয়া গুলি চালাবার পটভূমিতে এ গানটি রচিত। ১৯৪৭'র ১৫ আগষ্ট ব্রিটিশ শাসক কর্তৃক ক্ষমতাহস্তান্তর ও দেশভাগ হয়। কোচবিহার একটি করদরাজ্য ছিল। তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য সামন্ত নৃপতি কোচবিহারের মহারাজা তৎপর ছিলেন। গণচাপে কোচবিহার করদ রাজ্যটি একটি জেলারূপে পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভূক্তির কয়েকমাস পর এই গুলি বর্ষণের মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। 'খাদ্যের বদলে গুলি' গানটির কিছু তুলে ধরা যাকঃ

---অতঃপর শুনেন ভাই সব আরও দুঃখের কথা,
হইল হতাহত
হইল হতাহত অন্যায় মত একচল্লিশজন
পাঁচজন হইল শহীদ যখন তখন।
কবিতা প্রথম মরে
কবিতা প্রথম মরে তারপর সঙ্গী হইল তার
সতীশ, বাদল, বন্দনা আর বকুল তালুকদার।
শিশু সাত বৎসরের,
শিশু সাত বৎসরের বকুলের হইল মরণ,
ভ্রাতার সাথী হইল ভাগ্নী বন্দনা তখন।...

('লোকরঙ্গ')

গান, ছড়া, কবিতায় সাম্রাজ্যতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র, সামাজিক অনাচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জন্যে নিরলস সংগ্রাম করে লোককবি নিবারণ পন্ডিত গত ২ নভেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বাহাত্তর বৎসর হয়েছিল। গত কয়েক বৎসর ধরে তিনি দুরারোগ্য পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে একেবারে শয্যাশায়ী ছিলেন, তাঁর বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সরব কবির নীরব হয়ে যাওয়ায় এক অব্যক্ত যন্ত্রণাও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। মাঝে মাঝে ঝরে পড়া চোখের জলে এই যন্ত্রণার প্রকাশ হয়েছে। পরিচিত বন্ধু এবং সতীর্থ কেউ গেলে অপ্রকাশের অতল যন্ত্রণায় কাতর কবির এই চোখের জল দেখতে পেয়েছেন। তাঁর শেষ জীবনের দিনগুলিতে এটাই বড় ট্রাজেডি ছিল। এ মৃত্যু হয়তো অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে বাংলার সমাজসচেতন লোকগীতের সৃষ্টির ধারায় যে শূন্যতা এল, তা সহজে পূরণ হবার নয়।

নিবারণ পন্ডিত কিশোর থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত পরাধীন এবং স্বাধীন ভারতে বহু ধরনের গান লিখেছেন, তার লৌকিক সুরারোপ করে গান করেছেন। সহজ শব্দে, সরল ছন্দে, গদ্যের আঙ্গিককে এবং লৌকিক সুরে তাঁর গান লোক সমাজকে আলোড়িত করেছে। শ্রী হেমাঙ্গ বিশ্বাসের ভাষায় "লোক সমাজে তিনি গানের একজন জাদুকর", তাঁর গানের জাদুতে বঞ্চিত, শোষিত জনগণের বিশেষ করে কৃষিজীবী নরনারীর বুদ্ধি ও চেতনা প্রসারিত এবং শাণিত হয়। তাঁর গান শুধু বুদ্ধিকে নয়, হৃদয়কেও স্পর্শ করে। শ্রীজীবন দে'র ভাষায় তাঁর 'গান আর ছড়া যেন আগুন ছড়ায়।" 'পুঁথিপড়া, 'খাদ্যের বদলে গুলি' শীর্ষক গান মৈমনসিংহের নেত্রকোনায় এবং কোচবিহারে "আগুন" ছড়িয়েছিল। হাজং কৃষকদের বিদ্রোহ, যুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশভাগ, প্রভৃতির চিত্র তাঁর গানে ধরা আছে।

তাঁর রচিত বেশ কিছু গান গণসংগ্রামের দলিল হয়ে আছে, তা শোষিত বঞ্চিত নরনারীর সংগ্রামের দর্পণরূপে বিরাজ করছে। ইতিহাসের অনেক তথ্য এখানে পাওয়া যাবে, গণ সংগ্রামের ইতিহাস রচয়িতাগণ বহু তথ্য পাবেন। 'নীলবিদ্রোহ' শীর্ষক গানটি শুধু গান নয়, ইতিহাসের তথ্য বটে, ইংরেজ শোষকদের বিরুদ্ধে বাংলার নীলচাষীদের সংগ্রামের দলিলও ওটি।

১৯৪৮-'৫২-তে ভারতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে সরকারের অবর্ণনীয় দমননীতি চলেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি সহ বিভিন্ন গণসংগঠন অবৈধ ঘোষণা, হাজার হাজার কর্মী গ্রেপ্তার, একাধিক দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক সংবাদ পত্রের কন্ঠরোধ, গুলি ও হত্যা যেন নিত্যকার ঘটনা হয়েছিল। জেলে জেলে রাজবন্দীদের গুলি করে হত্যা করা হচ্ছিল। তখনকার ওই দমননীতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিবারণ পন্ডিত 'খাদ্যের বদলে গুলি' গান রচনা করে নিজের পয়সায় তা ছাপিয়ে হাটে হাটে গান করে বিক্রয় করলেন। উমা চরণ চক্রবর্তী ছদ্মনামে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। শোনা যায় এর লক্ষাধিক কপি সাধারণ মানুষের মধ্যে বিক্রি হয়েছিল।

নিবারণ পন্ডিত মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার সগড়া গ্রামে ১৯১২ সনের ২৭ ফেব্রুয়ারি এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ভগবান চন্দ্র ভট্টাচার্য। ভগবান চন্দ্রের একমাত্র পুত্র নিবারণ। কিশোর বয়সে নিবারণ তার পিতাকে হারিয়ে সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই দায়িত্ব গ্রহণ করে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে নিত্যসংগ্রামে অবতীর্ণ হন। বিড়ি শিল্পের একজন কারিগর হয়ে ওঠেন।

তিনি কিশোর বয়স থেকেই ছড়া ও গান গাইতে আরম্ভ করেন। তের বৎসর বয়সে তিনি প্রথম ছড়াগান লেখেন। সেকালের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং যৌবনে সশস্ত্র বিপ্লবপন্থীদের সংস্পর্শে আসেন, পরবর্তীকালে মার্কসবাদ-লেলিনবাদ তাঁর মনকে জয় করে। তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের পর তিনি কৃষক সমিতির কাজে নিজেকে যুক্ত করেন। এই কাজের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের স্বার্থে গান রচনার সাধনাও অব্যাহত রাখেন। নিবারণ পন্ডিত নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে বাংলার লোকগীতের বৈচিত্র্যময় সুরের অনুসরণ করেন। তাঁর কন্ঠে লোকগীত সমৃদ্ধিলাভ করে। তিনি কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অংশীদার হন। লোকনৃত্য গীত ও শিল্পের সবল ও সুস্থ ঐতিহ্যকে কমিউনিস্টরা যথেষ্ট মর্যাদা দিয়ে থাকেন। চল্লিশের দশকে বাংলায় কমিউনিস্ট শিল্পীরাই লোকনৃত্যগীত ও শিল্পের বিভিন্ন আঙ্গিক অনুসরণ করে সৃষ্টির কাজে নতুন গতিবেগ সঞ্চার করেন বহু অখ্যাত, অজ্ঞাত অথচ গুণী শিল্পী তাঁদের শিল্প সম্ভার নিয়ে সমগ্র দেশের সামনে হাজির হন। এঁদের মধ্যে নিবারণ পন্ডিত অন্যতম। মার্কসীয়-লেনিনীয় শিল্পাদর্শ নিবারণ পন্ডিতকে বড় করে তোলে। মার্কসীয়-লেনিনীয় মতাদর্শে তিনিও অবিচল থাকেন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে তার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকেন।

১৯৫০ সনে পূর্বপাকিস্তানের শাসকশ্রেণীর অত্যাচারে, কারা জীবন ভোগ করে নিবারণ পন্ডিত মৈমনসিংহ ত্যাগ করেন, পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। প্রথমে জলপাইগুড়ি জেলার কামাখ্যাগুড়িতে কিছুকাল অবস্থান করেন। পরে স্থায়ীভাবে কোচবিহার জেলার ভাউয়াগুড়িতে বসবাস করেন। মৈমনসিংহ জেলায় অবস্থান কালে বাংলার জারিগান নিবারণের কন্ঠে নতুনরূপ গ্রহণ করে। 'পুঁথি পড়া' গানখানি জারিগানের ঢং-এ ও সুরে নেত্রকোনায় সারাভারত কৃষক সম্মেলনে পরিবেশন করে এর প্রাণশক্তির পরিচয় তুলে ধরেন। উত্তরবঙ্গে এসে তিনি ভাওয়াইয়াগানের সুরকে নিয়েও পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। সুরকে অবিকৃত রেখে নতুন নতুন বিষয়বস্তুতে ভাওয়াইয়া গানকেও রূপান্তরিত করেন। বাংলার বাউল গানের সুর ও তাঁর গানে আরোপ করে বাউলের নতুনরূপ তুলে ধরেন। তিনি লোককবিরূপে খ্যাত হন। সুরকে বিকৃত করার তিনি বিরোধী ছিলেন। সরল ভাষা তাঁর গানের একটি বড় অলংকার ছিল।

নিবারণ পন্ডিত চিরকার সরল জীবন যাপন করেছেন। স্বল্পভাষী, সদালাপী, সাদাসিধে মানুষ ছিলেন। সারল্যই ছিল তাঁর জীবনের বড় অলংকার। কোন অহংকার তাঁর নির্মল চরিত্রকে স্পর্শ করতে পারেনি। চিরকাল তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে বাস করে তাদের সুখদুঃখ এবং সংগ্রামের জয়-পরাজয়ের বিশ্বস্ত সাথী হয়ে থেকেছেন। ধন এবং নামের মোহে ও লোভে এই স্বভূমি তিনি কখনও ত্যাগ করেননি। অনেক শিল্পী গ্রাম ছেড়ে শহরে স্থায়ীভাবে এসেছেন, একমাত্র নিবারণ পন্ডিত এর ব্যতিক্রম। এ ক্ষেত্রে তিনি অদ্বিতীয়। এরই জন্য হয়তো তার সৃজনশীল কর্মধারা অবিচ্যুত থেকে, তা দীর্ঘায়িত হতে পেরেছে। তের বছর বয়স থেকে বৃদ্ধবয়সে রোগে পঙ্গু হয়ে পড়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাঁর সঙ্গীত সাধনাকে অব্যাহত রাখতে পেরেছেন। অর্থাভাবে কষ্ট পেয়েও ধনের কাছে তিনি কখনও নিজেকে বিক্রয় করেন নি। তাঁর গানের কোন রেকর্ড নেই, রেডিওতে তাঁর গান কোন দিন প্রচারিত হয়নি, কিন্তু তাঁর গানের প্রচারে রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। 'নিবারণ পন্ডিতের গান' লোকগীতে এবং গণসঙ্গীতে স্থায়ী আসন পেয়েছে। শ্রমিক-কৃষকের ক্রমবর্ধিত জাগরণে এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক চেতনার প্রসারে এর স্থায়িত্ব ক্রমান্বয়ে দীর্ঘ হবে।

নিবারণ পন্ডিতের বহমান জীবন এবং গান যেন অভিন্ন হয়ে আছে। তাঁর গানের সুরে, শব্দে, ছন্দে কঠোর ও কোমলে সিক্ত তাঁর আটপৌড়ে জীবনের বিচিত্র রং এক হয়ে যেন মেখে আছে! সে জীবন একের হয়েও বহুর, বহুর হয়েও একের, সর্বদেশদর্শী ; তাঁর গানও সহজ ভাষায় ও লৌকিক সুরো গদ্যময় বিশ্বানুভূতিতে অনুরণিত হয়ে চলেছে। তাই মৃত্যু নেই।

সংস্কৃতি মন্ত্রীর শোকবার্তা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তথ্য ও

প্রয়াত লোককবি নিবারণ পন্ডিতের মৃত্যুতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রী প্রভাস ফদিকার শ্রী সন্তোষ কুমার পন্ডিতের নিকট প্রেরিত এক শোকবার্তায় শোক ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন যে,

লোক কবি নিবারণ পন্ডিতের মৃত্যুতে আমরা সকলেই শোকাহত। তিনি বাংলার লোকগীতির বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করেছিলেন, তাঁর নিরলস সাধনায় লোকগীতির সমৃদ্ধি হয়েছিল।

অবিভক্ত বাংলার ঐতিহাসিক কৃষক সংগ্রাম তাঁর রচিত গানে, সুরে এবং কন্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল। জারি গানকে তিনি নতুন রূপ দিয়েছিলেন।

দেশ ভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে শাসক শ্রেণীর নির্যাতন তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল। তিনি পশ্চিবঙ্গে চলে আসেন। বহু দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তিনি লোকগীতকে বর্জন করেন নি। বাংলার ভাওয়াইয়া গান তাঁর কন্ঠে নতুন ভাষা পায়। শ্রমজীবী মানুষের বিশেষ করে কৃষিজীবী দরিদ্র নরনারীর নিত্যকার ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁর কন্ঠে মূর্ত হয়ে ওঠে। লোকগীতে নিবারণ পন্ডিত একজন সমাজ সচেতন শিল্পী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন এবং একটি স্মরণীয় নাম হয়ে ওঠেন।

প্রয়াত পন্ডিত শুধুমাত্র একজন শিল্পী ছিলেন না, একজন সংগঠকও ছিলেন। রাজ্য লোক সংস্কৃতি পরিষদের গঠনকালে তিনি তার একজন সদস্য ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এবং লোক সংস্কৃতি পর্ষদের পক্ষ থেকে আমি প্রয়াত পন্ডিতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তাঁর শোকবিহ্বল বিধবা পত্নী, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়স্বজন এবং গুণমুগ্ধ সতীর্থদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

প্রথম থেকে সপ্তম, প্রত্যেকটি অর্থ কমিশনের রায় কেন্দ্রীয় সরকার নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রথম ব্যতিক্রম ঘটলো অষ্টম কমিশনের ক্ষেত্রে।

বর্তমান আর্থিক বছরে কমিশনের সুপারিশ কার্যকর না করার জন্য কেন্দ্রের যুক্তি :

(ক) কমিশনের রিপোর্ট দেরিতে দাখিল হয়েছে।

(খ) এত দেরিতে সুপারিশ কার্যকর করা হলে রাজ্যগুলির অসুবিধা হতো।

এবং (গ) রাজ্যগুলিকে তাদের প্রাপ্য আরো ১,৫০০ কোটি টাকা দেওয়ার মতো সামর্থ্য এ-বছর কেন্দ্রের নেই।

তথ্য কী বলে ?

১। দ্বিতীয় ও পঞ্চম অর্থ কমিশন তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেছিলেন যথাক্রমে সংশ্লিষ্ট বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর ও ৩১ জুলাই আর অষ্টম অর্থ কমিশন রিপোর্ট পেশ করেছেন ৩০ এপ্রিল। অর্থাৎ তুলনামূলক ভাবে আগেই।

২। কমিশনের রিপোর্ট কার্যকর করা হলে বাইশটি রাজ্য মিলে ১,৫০০ কোটি টাকা এ-বছর বাড়তি পেত। বাড়তি টাকা পেলে অসুবিধা হয় এমন কথা এর আগে কেউ শোনেন নি।

৩। এ-বছর কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হবার দুমাস পরে অর্থ কমিশন তাঁদের রিপোর্ট দাখিল করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করেই তাঁরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন এ-বছর এই ১,৫০০ কোটি টাকা রাজ্যগুলিকে দেওয়ার মতো সামর্থ্য কেন্দ্রের আছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ভারতবর্ষে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের সমস্যা ও নভেম্বর বিপ্লবের আলোকে তার সমাধান

শ্রীমতী শ্যামলী গুপ্ত

স্বাধীনতার তিনদশক আজ অতিক্রান্ত স্বভাবতঃই স্বাধীন ভারতবর্ষের সামগ্রিক অগ্রগতির খতিয়ান নিতে গেলে যে প্রসঙ্গ প্রথমেই আসে তা হলো সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজ প্রতিটি অংশের মানুষের অগ্রগতির হিসাব। স্বাধীন ভারতের শাসনব্যবস্থা আমাদের জনজীবনের মৌলিক চাহিদা গুলোকে কতটুকু পূরণ করতে পেরেছে বা পূরণের জন্য যে বাস্তব সম্মত পরিকল্পনা তা কতটা কার্যকরী করা হয়েছে এ প্রশ্ন আজ স্বভাবতই সবার। খাদ্যবস্ত্র, বাসস্থান ও স্বাস্থ্যের পরেই যে মৌলিক অধিকার একজন নাগরিক রাষ্ট্রের কাছে দাবি করতে পারে–তা হলো শিক্ষা।

সমাজের অনগ্রসর ও পশ্চাদ্‌পদ অংশের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিয়ে সমাজ সচেতন নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার যে প্রচেষ্টা তা রাষ্ট্রের কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে।

না মৌলিক অধিকার নয় তবে ভারতের সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতিতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত বালক বালিকাকে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় আনার এক মহৎ সংকল্প লিখিত হয়েছিল ১৯৫০ সালে সংবিধান রচনার সময়।

দশবছরের মধ্যে ভারতের সকল মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক ব্যয়মুক্ত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতিও ছিল।

তারপর নদী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেলেও পরিবর্তনের অনেক ঢেউ ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় আছড়ে পড়লেও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকরী করার পরিকল্পনা বাস্তবে ফলপ্রসূ হয়নি।

সর্বশেষ জনগণনা অনুযায়ী বর্তমানে ভারতবর্ষে সাক্ষরতার হার শতকরা ৩৩% জন আর নারীর সাক্ষরতার হার শতকরা ২৪.৮% জন। আদমসুমারী নিরপেক্ষ বিচারের ভিত্তিতেই তথ্য সংগ্রহ করে দেয়। সেই তথ্যও আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় শিক্ষা ক্ষেত্রে এখনও ভারতবর্ষ কত অনগ্রসর।

স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের সমস্যা সামগ্রিক শিক্ষা বিস্তারের সমস্যা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে তাই আলোচনা করা সম্ভব নয়। আর্থ–সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তিতেই একটা দেশের শিক্ষা সমস্যাকে আলোকিত করতে হয়।

আমাদের দেশের শাসক শ্রেণী শ্রেণীস্বার্থেই শোষিত শ্রেণীর উপর শোষক শ্রেণীর নিপীড়নকে কায়েম রাখার প্রয়োজনেই সকলের জন্য শিক্ষার দ্বারকে মুক্ত করে দেন নি।

ভারতবর্ষের আধা সামন্ততান্ত্রিক ও আধা ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা শিক্ষা শাসক ও শোষক শ্রেণীর হাতিয়ার হিসাবেই ব্যবহৃত হয় ও হচ্ছে। অতীতেও শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোহিত, মৌলভী ও ধর্মযাজকদের হাতে তাদের চৌহদ্দির মধ্যে আটকে থেকে শাসক শ্রেণীকে সেবা করেছে। বর্তমানে এই নির্লজ্জ খবরদারি না থাকলেও শিক্ষাকে ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে শাসক শ্রেণী একে পণ্য সামগ্রী করে তুলেছে। যে দেশে শতকরা ৬০% ভাগ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে শিক্ষা তাদের কাছে তাই বিলাসিতা।

অপর দিকে গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থাকে যারা নিয়ন্ত্রণ করে তারা শ্রেণী স্বার্থেই আপামর জন সাধারণের জন্য গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার কথা চিন্তা করবেন না খুব সঙ্গত কারণেই।

ব্রিটিশরা যখন ভারতে তাদের শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিল তখন তাদের শাসন ব্যবস্থার স্বার্থে কতিপয় মানুষকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুললো। অফিস আদালত ইত্যাদি পরিচালনার প্রশ্নে সাহায্যকারী শ্রেণী হিসাবে এদেশের মুষ্টিমেয় লোককে তারা শিক্ষার সুযোগ দিল। ইংরাজ শাসনকালে ভারতবর্ষে মাত্র তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। আর প্রতিটি জেলায় একটি করে হাইস্কুল খোলার লক্ষ্য মাত্রা ইংরেজদের শিক্ষার প্রারম্ভেই শিক্ষাকে বিত্তশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাই এর উদ্দেশ্য।

স্বভাবতই শিক্ষা যেখানে অবাধ নয়, স্ত্রী শিক্ষার প্রসঙ্গ সেখানে অবান্তর।

তবুও ইংরেজ আমলেই স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের মহৎ প্রচেষ্টার কোন কোন একক ব্যক্তিত্ব এগিয়ে এসে ছিলেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ডেভিডহেয়ার, বেথুনসাহেব পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বার যখন এ দেশে উন্মুক্ত করেন তখন সেই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজ সংস্কারকগণ বিশেষত: বিদ্যাসাগর মহাশয় স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে উদ্যোগ নেন। কিন্তু সেখানেও দেখা যায় সমাজের কুলীন অংশ ও বিত্তবান ঘরের মহিলারাই শুধুমাত্র এই সুযোগটুকু গ্রহণ করতে পারলেন।

প্রথমাবস্থায় ইংরেজ সরকার যেটুকু উৎসাহ প্রদান করেছিলেন পরবর্তীকালে আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে কার্যত স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টার মূলে আঘাত হানলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় তার একক প্রচেষ্টায় অর্থ সংগ্রহ করে নারী শিক্ষা বিস্তারের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। যদিও তৎকালীন রামমোহনের একটি ক্ষুদ্র অংশ তাকে সাহায্য করেছিল কিন্তু ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মের ধারক বাহকেরা স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে প্রভূত বাধা সৃষ্টি শুধু করেন নি, তাকে শাস্ত্র বিরোধীও প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে। তাই মনুর শ্লোক উদ্ধৃত করে "কন্যা পেবং পালনীয়া শিক্ষা নিয়তি যত্নতে" বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লড়াই করতে হয়েছে। তবুও অগ্রগতি হয়েছে কতটুকু। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর প্রায় একশত বছর হতে চলল ইংরেজ শাসকদের মতনই স্বাধীন দেশের শাসক শ্রেণীর প্রয়োজন মিটাবার প্রশ্নেই শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব নিয়েছেন–আর সে শিক্ষা জীবন-বিমুখশিক্ষা।

জীবন-বিমুখ এই শিক্ষা ব্যবস্থা ইংরেজ শাসকদলের অবদান। রবীন্দ্রনাথ তাই শিক্ষার এই সার্বিক সংকটের বিরুদ্ধে এই শতাব্দীকে সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন। জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগ করার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন তিনি দেখলেও এই সংকটের মূলে ভারতের সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা তা তিনি তুলে ধরেন নি।

স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের প্রসঙ্গে অনেকেই অবতারণা করেন প্রাচীন ভারতে গার্গী, মৈত্রেয়ী, লীলাবতী খনাবতীর কথা। কিন্তু এঁরা হচ্ছেন সমাজে ব্যতিক্রম। সামগ্রিকভাবে প্রাচীন ভারত থেকে আধুনিক ভারতে জনসংখ্যার অর্ধেক যে নারীজাতি অজ্ঞানতা অশিক্ষার অন্ধকারে অতীতেও ছিল আজও আছে।

শোষণ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী জাতিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের আওতায় রাখার জন্য শিক্ষা প্রসারের প্রশ্নে স্বভাবতঃই শাসকশ্রেণী থেকেছে উদাসীন। যুগ যুগ ধরে নারীদের বোঝান হয়েছে–তাদের স্থান অন্তঃপুরে। সামাজিক উৎপাদনের কাছে তাদের শ্রমকে না লাগিয়ে পারিবারিক প্রয়োজনে রান্না ঘর ও সন্তান পালন করার মধ্যেই তার শ্রমশক্তিকে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে নারী পুরুষের অধীন, তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা পুরুষ দিতে সক্ষম এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আজও গোটা সমাজ ব্যবস্থা চলছে।

নারীকে সহজভাবে এই সমাজ ব্যবস্থা মেনে নেওয়ার জন্য শাসকশ্রেণী কিছু ব্যবস্থা রেখেছে। প্রথমত: ধর্ম ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, দ্বিতীয়ত: নিরক্ষরতা, তৃতীয়ত: কুসংস্কার।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থাই একমাত্র পারে স্ত্রী জাতির মনকে সংস্কার মুক্ত করতে।

শিক্ষা ব্যবস্থার আওতার বাইরে নারীজাতির বৃহৎ অংশ যারা শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত, তাদের রাখতে পারলে বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণীই লাভবান হবেন। তাই কাগজে কলমে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের কথা বললেও–স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে অনেক কমিশন গঠন হলেও–শাসক শ্রেণী প্রকৃত পক্ষে নারী শিক্ষা প্রগতির দিকে নজর দেন নি। নারীরা শিক্ষিতা হলে শোষক ও শাসক শ্রেণীর অসুবিধার কারণ। নারী অর্থনৈতিক সাবলম্বনের দাবি সমাজ জীবনের বৃহত্তর স্বাধীনতার দাবির সঙ্গে যুক্ত হোক শোষক শ্রেণী চায় না।

সমাজে নারী অসহায় অবস্থায় বাস করুক এই রক্ষণশীল চিন্তা মেয়েদের এগোবার পথে বাধা দেয়। যুগ যুগ ধরে একটা অচলায়তনের বাধা ভাঙতে না পেরে মেয়েদের ভাবনা চিন্তাও সংকীর্ণ হয়ে উঠেছে। শিক্ষার আলো না থাকায় বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা বিকাশ হতে পারেনি। –তাই জীবনের সঠিক পথের নিশানা আমাদের দেশের নারী সমাজ খুঁজে পায়নি।

পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে–আজও স্বাধীন ভারতে মেয়েদের স্থান সমাজে নির্দ্ধারিত।

বুর্জোয়া শিক্ষা ধারা এমনি ফল যে সামান্য কয়েকজন শ্রমিক কৃষক শ্রেণীর মেয়েরা শিক্ষালাভের সুযোগ পায় তারাও অনেক সময় নিজ শ্রেণীর মেয়েদের আর সমগোত্রীয় মনে করে না বা নিজ পেশার যে শ্রম তাকে মর্যাদা দিতে লজ্জা বোধ করে।

আদম সুমারীর হিসাব অনুযায়ী ১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সের দশ কোটি নারী নিরক্ষর। নানা পরিকল্পনা, স্কীম ও মডেল করেছেন দিল্লীর এফ. সি. আর. টি., নারী শিক্ষা প্রসারে বয়স্কা শিক্ষা কেন্দ্র চালু করলেও সংখ্যার দিকে থেকে যেমন তা অপ্রতুল আর্থিক সাহায্য তেমনি নগণ্য। যার ফলে বাক্য বিন্যাস যা হয়েছে ফল হয়েছে তার অনেক কম। তাছাড়া যাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করার পরিকল্পনা হচ্ছে তারা অশিক্ষিত নয় নিরক্ষর। সাক্ষর হলেই নারীজাতি তার জীবনের সব সমস্যা সমাধান করতে পারবেন–এমন ভাবার কোন কারণ নেই তবুও যদি কথা ধরা হয় তাও স্বাধীনতার ৩৭ বছরে কার্যকরী হয়নি। সাক্ষরতা বা ভাষা শিক্ষা জীবন হতে বিচ্ছিন্ন ভাবে আসতে পারেনা। একজন শ্রমিক বা কৃষক ঘরের নারীকে সাক্ষরতা প্রশ্নকে তার জীবনের মৌলিক সমস্যা সমাধানের সঙ্গে যুক্ত করতে না পারলে এই সাক্ষরতা তার কাছে বাড়তি একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াবে, প্রয়োজন ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা না গড়ে তুললে শিক্ষা একটা প্রহসন হয়ে দাঁড়ায়। শৈশব থেকে একজন শিশুর পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা বিচ্ছিন্ন যে শিক্ষা তা তাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আত্মসর্বস্ব করে তোলে। এ কথা স্ত্রী শিক্ষা প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য। শিক্ষাকে সার্বজনীন করে তোলার প্রচেষ্টায় প্রথাবদ্ধ ও প্রথামুক্ত বিদ্যালয়ে মেয়েদের পড়বার সুযোগ করে দিয়ে ১৯৭১-এর ও ১৯৮১-এর আদম সুমারীর তুলনা করলে দেখা যাবে– ১৯৭১–২২.৪২ ১৯৮১–৩০.৩৩

দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় স্ত্রী শিক্ষার হার লক্ষণীয় ভাবে বেড়েছে। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থা সহ শিক্ষামূলক। সেখানে ১৯৬৬-৬৭ থেকে ১৯৭৬-৭৭ সাল পর্যন্ত দশবছরের হিসাবে দেখা যায় (economic Review 1983-84) প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে আট হাজার। ১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৮২-৮৩ এই বছরেও প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। বলা বাহুল্য ঐ সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা ক্রমবর্ধমান।

এই নতুন শিক্ষা নারীকে কি দেবে বিজ্ঞান ভিত্তিক এই শিক্ষা পুরাতন কুসংস্কারের বেড়া জালকে ভেঙে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে চেনবার ও ন্যায় অন্যায় বোধকে জাগ্রত করে গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার সুযোগ দেবে। এই চেতনা বোধ সমাজ পরিবর্তনের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবে নারী সমাজকে, যে পরিবর্তনের লড়াই একমাত্র নারী জাতিকে সামগ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থার সুযোগ দেবে।

নারী জাতির পূর্ণমুক্তি একমাত্র সমাজ তান্ত্রিক বিপ্লবের পরেই সম্পন্ন হতে পারে। যে সমাজ নারীকে তার পূর্ণ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠা করে পারিবারিক দাসত্বের হাত থেকে শুধু মুক্তি দেবে তাই নয় সামাজিক উৎপাদনের কাজে তাকে অংশ গ্রহণ করতে সাহায্য করবে।

নভেম্বর বিপ্লবের পরে সোভিয়েত সমাজে নারী জাতির অগ্রগতি এ কথাই শিক্ষা দেয়। ১৯৮১-৮২ শিক্ষা বর্ষে সোভিয়েত রাশিয়ায় সারাদেশের কলেজ ও বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৫২ ভাগ হচ্ছে মেয়ে এবং বিশেষ মাধ্যমিক কোর্সের ছাত্র ছাত্রীদের শতকরা ৫৭জন নারী। ১৯৪১ সালের তুলনায় বিশেষ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রাপ্ত মহিলার সংখ্যা ১৯৮১ সালে বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মহিলা বিশেষজ্ঞের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৬% থেকে ৫৯% শতাংশ।

এই শিক্ষা বৃদ্ধির হার স্বভাবতই নারী জাতিকে সমাজতন্ত্র গড়ার বিশাল কর্মকান্ডের মধ্যে টেনে এনেছে। তাই আজ প্রতিটি পূর্ণ বয়স্কা নারীই সামাজিক উৎপাদনের কাজে সে দেশে অংশ গ্রহণ করছে।

নারী পুরুষের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার সোভিয়েত রাশিয়ায় আজ শুধু আইন নয় ঐ অতি বাস্তব সত্য।

তাই নিপীড়িত স্ত্রী জাতির স্বাধীনতা ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার একমাত্র শর্তই হল সমাজ তান্ত্রিক বিপ্লব–যার মধ্য দিয়ে নারীজাতির অন্য অংশের নিপীড়িত মানুষের সাথে খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মৌলিক অধিকার সবার জন্য দাবি করতে পারবে।

তবে এর জন্য চাই সুদীর্ঘ সংগ্রাম, চাই সামাজিক ব্যবস্থা ও রীতিনীতির আমূল পরিবর্তন, সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিজয়ের মধ্যেই এই সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি

পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৯৮৩-৮৪ সালে সমবায় আন্দোলন যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে। সমবায় আন্দোলনের প্রধান বিস্তার গ্রাম বাংলার কৃষি ক্ষেত্রে। কৃষকদের চাষের মরশুমে সমবায় সমিতি মারফৎ স্বল্প মেয়াদী কৃষিঋণ দেওয়া হয়ে থাকে। ১৯৮২-৮৩ সালের তুলনায় ১৯৮৩-৮৪ সালে স্বল্প মেয়াদী কৃষি ঋণ আদায় মোটামুটি সন্তোষজনক। ১৯৮২-৮৩ সালে মোট ৩১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা ও ১৯৮৩-৮৪ সালে ৩৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা কৃষিঋণ দেওয়া হয়েছিল। ১৯৮২-৮৩ সালে ঋণের আদায় আশানুরূপ হয়নি। মাত্র ৩০.৩ শতাংশ ঋণ আদায় হয়েছিল। ১৯৮৩-৮৪ সালে ঋণের আদায় পূর্ববর্তী বৎসরের চেয়ে অনেকটা ভাল অর্থাৎ ৪১.৩ শতাংশ। অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ প্রায় দেড়শ কোটি টাকা।

গ্রাম বাংলার প্রায় ৭৪৮০টি প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতি রয়েছে। কৃষি ঋণের সহায়ক হিসাবে ভূমি উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী কৃষিঋণ দেওয়া হয়ে থাকে। কূপ ও ইঁদারা খনন, পাম্পসেট সহ অগভীর নলকূপ, পুকুর সংস্কার ও খনন, ফলের চাষ, পানের চাষ, ট্র্যাক্টর ও পাওয়ার টিলার, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, গোয়ালঘর ও গুদামঘর নির্মাণের জন্য দীর্ঘমেয়াদী কৃষিঋণ দেওয়া হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে একটি কেন্দ্রীয় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক ও ২৪টি প্রাথমিক ভূমি সমবায় ব্যাংক রয়েছে।

কৃষিজ দ্রব্যের সংরক্ষণ, বিপনন ও প্রকরণের সমবায় ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গে সঠিক পদ্ধতিতে চালানো হচ্ছে। ৩৩ হাজার ৭ শ ১৭টি গ্রাম নিয়ে থানা ভিত্তিক ২৯৬টি প্রাথমিক বিপণন সমবায় সমিতি কাজ করছে। এদের মোট সভ্য সংখ্যা আনুমাণিক ১ লক্ষ ১৭ হাজার। মোট ৪৬টি সমবায় প্রকরণ সমিতি পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে। এযাবৎ ৩৫টি হিমঘরের মধ্যে ২৪টিতে কাজ আরম্ভ হয়েছে।

ক্রেতা সমবায় পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গ। একটি শীর্ষ ফেডারেশন, ২৮টি পাইকারী সমবায় সমিতি এবং প্রায় আড়াই হাজার প্রাথমিক ক্রেতা সমবায় সমিতি ভোগ্যপণ্য সরবরাহের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। এছাড়া সুদূর গ্রামাঞ্চলে কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি বিপণন সমবায় সমিতি মারফৎ ভোগ্যপণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে। গরিব ও দুর্ব্বলতর শ্রেণীর জন্য কন্ট্রোলের কাপড় ও স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্বল্প মূল্যে খাতা ক্রেতা সমবায়ের মাধ্যমে বিক্রী করা হয়।

নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাসগৃহ সমস্যা সমাধান কল্পে আবাসন সমবায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। জীবনবীমা কর্পোরেশন থেকে রাজ্য সরকারের গ্যারান্টিতে প্রাপ্ত গৃহ নির্মাণ ঋণ ২০ বছরে ৮০টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য শর্তে বিভিন্ন প্রাথমিক আবাসন সমবায় সমিতিকে দেওয়া হয়ে থাকে। এ যাবৎ শীর্ষ সমবায় আবাসন সমিতি জীবন বীমা কর্পোরেশন থেকে ২৯ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ঋণ পেয়েছে। নিজস্ব অর্থ সহ প্রায় ৩১ কোটি টাকা বিভিন্ন প্রাথমিক সমবায় সমিতিকে ঋণ দেওয়া হয়েছে ও প্রায় ১১ হাজার বাড়ী ফ্ল্যাট আবাসন সমবায়ের মাধ্যমে নির্মিত হয়েছে।

সমবায় শিক্ষা ও প্রসার

জেলা সমবায় ইউনিয়ন ও রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের ভূমিকা

সমবায় আন্দোলনের সার্থকতার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন সমবায় শিক্ষা। পৃথিবীর যে সব দেশে-পুঁজিবাদী দেশ অথবা সমাজতান্ত্রিক দেশ যেখানেই সমবায় আন্দোলন সার্থকতা লাভ করেছে, সেখানেই সমবায় শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার ন্যাস্ত আছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন ও তার সহযোগী ২০টি জেলা সমবায় ইউনিয়নের উপর। ইউনিয়নের কাজকর্মের মধ্যে সমবায় শিক্ষার প্রচার ও প্রশিক্ষণই মুখ্য। সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া সৃষ্টির জন্য এবং সমবায় আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে সমীক্ষা এবং গবেষণার ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন স্তরে সমবায় সম্পর্কিত বিষয়ে জনমত গড়ে তোলা এবং মতামত প্রকাশ করা। সেমিনার, সম্মেলন এবং প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করার মত বিষয়গুলিও ইউনিয়নের কাজকর্ম ও উদ্দেশ্যের অর্ন্তভুক্ত।

বর্তমানে সমবায় সমিতির কর্মচারী এবং সমবায় দপ্তরের কর্মচারীদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য উত্তরপাড়া, বড়শুল, ঝাড়গ্রাম, কালিম্পং, ইলামবাজার এবং জলপাইগুড়িতে সমবায় শিক্ষণকেন্দ্র আছে। অদূর ভবিষ্যতে আরো দুটি সমবায় শিক্ষণ কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে। বিষয়টি বর্তমানে রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন।

এছাড়া পরিচালকমন্ডলীর সদস্য, সাধারণ সদস্য, বেতনভুক সেক্রেটারী, ম্যানেজারদের নিয়মিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য সারা রাজ্যে ৩০ জন সমবায় শিক্ষা নির্দেশক ও ৪ জন সমবায় শিক্ষা নির্দেশিকা আছেন। সমবায় শিক্ষার মূল কাঠামোতে এছাড়া রয়েছেন একজন সমবায় শিক্ষা আধিকারিক, দুইজন সহকারী শিক্ষা আধিকারিক ও একজন মহিলা শিক্ষা আধিকারিক।

শ্রমজীবী সমবায় (লেবার কো-অপারেটিভ)

৭৬-৭৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে লেবার কো-অপারেটিভের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৬৮টি। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৭-৭৮ সাল থেকে ৮১-৮২ এই পাঁচ বছরেই সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৭২২টি। ৭৬-৭৭ সালে লেবার কো-অপারেটিভগুলি মাত্র ৬৫ লক্ষ ২১ হাজার টাকার কাজ করেছিল। কিন্তু ৮১-৮২ পর্যন্ত এক কোটি আটানব্বই লক্ষ বাহাত্তর হাজার টাকার কাজ করেছিল। নিঃসন্দেহে এ কাজ প্রশংসনীয়।

ইঞ্জিনীয়ার্স কো-অপারেটিভ

৭৬-৭৭ সাল পর্যন্ত ইঞ্জিনীয়ার্স কো-অপারেটিভের সংখ্যা ছিল মোট ৪৮১ টি। ৭৬-৭৭ সালে ঐ সমিতিগুলি মোট চার কোটি ছিয়াশি লক্ষ টাকার কাজ করেছিল। কিন্তু ৭৭-৭৮ থেকে ৮১-৮২ সাল পর্যন্ত সমিতির সংখ্যা দাঁড়ায় মোট ৫৪৭টি। একমাত্র ৮১-৮২ সালে কাজের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৯ কোটি ১১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকায়।

শিল্প সমবায়

৭৬-৭৭ সাল পর্যন্ত মোট প্রাথমিক শিল্প সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ১১৯২টি, এবং সম্মিলিত অংশগত মূলধন ছিল ২৬ লক্ষ টাকা। ৮১-৮২ পর্যন্ত সমিতির সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ১৩১৪টি এবং ৫৪ লক্ষ টাকার অংশগত মূলধন তৈরি হয়।

তন্তুবায়

৭৬-৭৭ সাল পর্যন্ত মোট প্রাথমিক তন্তুবায় সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ১২৯৯টি ও সভ্য সংখ্যা ছিল ৭৮,৯৩৫। কিন্তু এর পরের পাঁচ বছরে তন্তুবায় সমিতির সংখ্যা দাঁড়ায় মোট ১৪৯১টি এবং সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় মোট ৯১,৩০৩।

তন্তুবায় প্রসংগে তন্তুজের কথা স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায়। তাঁত শিল্প ও তন্তুবায় শ্রেণীর সার্বিক কল্যাণের জন্যই ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যান্ডলুম উইভার্স কোঅপারেটিভ সোসাইটির জন্ম। এ পর্যন্ত ৭৬৪টি প্রাথমিক তন্তুবায় সমবায় সমিতি এই শীর্ষ সমিতির সদস্যভুক্ত। ১৯৮২-৮৩ সালে "তন্তুজ" মোট ২২ কোটি টাকার বস্ত্র সামগ্রী বিক্রয় করে। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার "স্বল্প সুদে কার্যকরী মূলধন ঋণদান" প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত হয়ে শীর্ষ সমিতি ১৯৮২-৮৩ সাল পর্যন্ত ১৪ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকার ঋণ গ্রহণের অধিকার লাভ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে মোট ৭৮টি ও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ২৮টি তন্তুজ কাপড়ের বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে।

হুগলি নদী জলপথ

সমবায়ের কার্যক্ষেত্রে হুগলি নদী জলপথ পরিবহন সমবায় সমিতি একটি উল্লেখযোগ্য নাম। ১৯৮০ সালে জন্ম লাভ করে এই সমিতি ইতিমধ্যেই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কোলকাতা থেকে হাওড়ার মধ্যে ফেরী পারাপার করে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর চলার পথ সুগম করে দিতে পেরেছে। বর্তমানে ২৩৫ জন কর্মীর চাকুরির সংস্থান হয়েছে এই সমিতিতে। সমিতির দৈনিক আয় আনুমানিক ১৫,০০০ টাকা।

সিনেমা কো-অপারেটিভ

চলচ্চিত্র শিল্পের কলাকুশলীদের নিয়ে কোলকাতায় একটি সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে। রাজ্য সরকার ২ লক্ষ ৪১ হাজার টাকার সাহায্য দিয়েছেন। এই সমিতি কলাকুশলীদের নিয়ে চলচ্চিত্র শিল্পের কাজে নিয়োজিত থাকবে।

গ্রামীণ বিদ্যুৎ সরবরাহ সমবায়

গ্রামীণ বৈদ্যুতিক নিগমের সহায়তায় হুগলী জেলার সিঙ্গুর-হরিপালে একটি গ্রামীণ বিদ্যুৎ সরবরাহ সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে। এ যাবৎ রাজ্য সরকার ২০ লক্ষ টাকার শেয়ার ক্রয় করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলন

মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা–	২১,৪৯১

কৃষি ঋণ সমবায় সমিতি

স্বল্প মেয়াদী কৃষি	১৯৮২-৮৩	৩১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা
ঋণ দেওয়া হয়েছে:	১৯৮৩-৮৪	৩৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা
কৃষি ঋণ আদায়:	১৯৮২-৮৩	৩০.৩ শতাংশ
	১৯৮৩-৮৪	৪১.৩ শতাংশ

কৃষি ঋণ সমবায় সমিতিতে সরকার ক্রীত শেয়ার:	৪ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা
দীর্ঘ মেয়াদী কৃষি ঋণ	১৯৮৩-৮৪ ৬ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা

ঐ কৃষি ঋণ আদায়:

বিপণন সমবায় সমিতি

১৯৮৩-৮৪ সালের বিপণনের প্রধান প্রধান বিষয়:-

কৃষিজ দ্রব্য –	১৮ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা
ফল ও সব্জী –	৪০ লক্ষ টাকা
বীজ –	১২০ লক্ষ টাকা
সার –	৩৫ কোটি টাকা

সরকারি সাহায্য:

গুদাম নির্মাণ

গ্রামীণ গুদাম –	১১৩১টি
প্রধান গুদাম –	৭৮টি
পাট বাছাই কল	৮২টি

আবাসন সমবায় সমিতি

মোট সংখ্যা –	১,৪১১
জীবন বীমা কর্পোরেশন – হইতে প্রাপ্ত ঋণ	২৯ কোটি ১০ লক্ষ
নির্মিত গৃহ নির্মাণের সংখ্যা –	১১ হাজার (আনুমানিক)

ক্রেতা সমবায়

শীর্ষ ক্রেতা সমবায় সংখ্যা –	১
পাইকারী ক্রেতা সমবায় –	২৮
প্রাথমিক ক্রেতা সমবায় –	২৩৮৪
মোট সভ্য সংখ্যা –	৫.৪০ লক্ষ
মোট কার্যকরী মূলধন –	১৮.৮৫ লক্ষ টাকা
গড় বার্ষিক বিক্রয় –	১০৫ কোটি টাকা
গড় বার্ষিক ক্রয় –	১২০ কোটি টাকা
সমবায়িকার সংখ্যা –	১৫

রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পরিসংখ্যান

	১৯৮১-৮২	১৯৮৩-৮৩
জেলা সমবায় ইউনিয়নের সংখ্যা	২০	২০
শিক্ষণ কেন্দ্র	৬	৬
শিক্ষা নির্দেশকের সংখ্যা	৩৪	৩৪
প্রশিক্ষিত পরিচালক-দের সংখ্যা	২৯৫৮	২৩৬৩
প্রশিক্ষিত সাধারণ সভ্যের সংখ্যা	১১৮১২	১০৪০৪
প্রশিক্ষিত সেক্রেটারী ম্যানেজারের সংখ্যা	৮২৪	৪৯৯



স্থানীয় শাসন ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রী শৈলেন সরকার নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে রাইটার্স বিল্ডিংস-এর ক্যান্টিন হলে কলকাতা জেলা সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত এক সভায় বক্তব্য রাখছেন।

ভারতের অর্থ কমিশন ও রাজ্য অর্থনীতি

মুরারি ঘোষ

(৫)
অর্থকমিশন ও রাজ্য অর্থ-ব্যবস্থা

নিমেয়ার পদ্ধতি ঃ

অর্থ কমিশনগুলি মোটামুটি যে নীতি ও পদ্ধতিতে রাজ্যগুলির আর্থিক প্রয়োজন বিচার করে থাকে সেটি প্রথামত স্যার অটো নিমেয়ারের রচনা। নিমেয়ার ছিলেন অস্ট্রেলিয়ায় কমনওয়েলথ গ্রান্টস কমিশনের সদস্য। অস্ট্রেলিয়ায় ঐ কমিশন ঐ দেশের বিভিন্ন প্রদেশের বাজেট ব্যয়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ভান্ডার থেকে রাজস্ব অনুদানের ব্যবস্থা করে থাকে। বৃটিশ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার মধ্যে তথাকথিত ফেডারেল শাসন ব্যবস্থার অর্থনৈতিক কাঠামো কীভাবে চালু রাখা যায় নিমেয়ার ছিলেন সেই ব্যাপারে দক্ষ। এ দেশে বৃটিশ সরকারের আমন্ত্রণ নিয়ে প্রদেশগুলির আর্থিক প্রয়োজনীয়তা ও তজ্জনিত রাজস্ব বিভাজন পদ্ধতি স্থির করার জন্যই নিমেয়ার এদেশে এসেছিলেন।

এ দেশে এসে নিমেয়ার মেস্টন কমিটির সুপারিশ, ইন্ডিয়ান ট্যাক্সেসান ইনকোয়ারি কমিটি রিপোর্ট, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটুটরী কমিশনের রিপোর্ট, পীল কমিটি, পার্সী কমিটি, জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটি—সকলের সুপারিশ বিচার করে রাজস্ব বিভাজন ও কেন্দ্র থেকে অনুদান দেওয়ার যে পদ্ধতি গ্রহণ করলেন (১৯৩৬ তা সম্পূর্ণতই ১৯৩৫-এর ভারত শাসন বিধির অনুকূলেই রাখা ছিল। আসলে ভারত শাসন বিধিকে এড়িয়ে অন্য কিছু করার সাধ্য নিমেয়ারের ছিল না। উপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে প্রদেশগুলির তথাকথিত আর্থিক স্বায়ত্তশাসন কিভাবে কার্যকর হতে পারে এই ব্যবস্থায় তা দেখা গেল। বৃটিশ কলোনীর অর্থনৈতিক পরিবেশে ফেডারেল আর্থিক ব্যবস্থার ভাঁওতা দিয়ে কিভাবে সাম্রাজ্য বজায় রাখা যায় নিমেয়ার সেই তত্ত্বে দক্ষ ছিলেন সন্দেহ নেই।

নিমেয়ারের এই ব্যবস্থা গৃহীত হবার পর যে ব্যবস্থায় সাম্রাজ্য বজায় থাকবে এবং তথাকথিত ফেডারেল শাসন ব্যবস্থাও বজায় থাকবে—এই জোড়াতালি দেওয়া ব্যবস্থার চাপে একটি উন্নয়ন বিমুখ অনগ্রসর দেশের অর্থনীতি বেশ কয়েকবছর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছিল। কিন্তু ব্যবস্থাটি মুখ থুবড়ে পড়লো পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়ে। মন্বন্তরের প্রথম ধাক্কায় সম্বলহীন বাংলার অর্থনীতি সম্পূর্ণতই ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক রমরমা বজায় ছিল। এমনকি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চাপ, এক বিশাল সেনাবাহিনীর ভরণ পোষণ, যুদ্ধের চাপে বহির্বাণিজ্যের অবনতি ইত্যাদি সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যে বজায় ছিল। তখন এই প্রদেশের ভঙ্গুর আঞ্চলিক অর্থনীতিকে কোনরকমে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রদেশের বাইরের সাহায্য প্রয়োজন হয়—সে সাহায্য অবশ্য তৎকালীন কেন্দ্র থেকেই এসেছিল। কিন্তু এই ঘটনায় বাস্তবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে প্রাদেশিক অর্থনীতির স্বনির্ভরতা সাম্রাজ্যবাদের কাম্য ছিল না। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার যে নিমেয়ার রচিত আর্থিক ব্যবস্থা যা একদা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে পরিপুষ্ট করেছে, প্রাদেশিক বা জাতীয় অর্থনীতিকে নয় সেটি মাছিমারা কেরাণীর মত অনুসরণ করতে স্বাধীন ভারতীয় নেতৃবর্গের মনে কোন প্রশ্নের উদয় হয় নি।

এই ধরনের আর্থিক নীতির সীমাবদ্ধতা এবং অসার্থকতা পরবর্তীকালে অর্থ কমিশনগুলিরও নজরে আসেনি। এমনকি পরবর্তী কালে প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যেই উন্নয়নমূলক যোজনার আর্থিক দায়িত্ব নিয়েও প্রাদেশিক বা রাজ্য অর্থনীতি কিভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারে তাও ভেবে দেখা হয়নি। বরং প্রথম দুটি অর্থ কমিশন নিমেয়ারের ব্যবস্থাকে স্বাধীন ভারতীয় পটভূমিকায় যথেষ্ট কার্যকর বলে সার্টিফিকেট দিয়েছে।[১] নিমেয়ারের নির্দেশিত ব্যবস্থায় প্রদেশগুলির প্রশাসনিক আয়ব্যয় কোন ক্রমে সাম্যস্থিতি বজায় রাখতে পারলেই তা যথেষ্ট বলে স্বীকৃত ছিল এবং মনে করা হোত আঞ্চলিক উন্নয়নের তাগিদে প্রাদেশিক ব্যয়-কর্ম কখনোই যেন সাম্রাজ্যবাদী কেন্দ্রের ভান্ডারকে বিব্রত না করে। যদিও রাজ্যগুলি থেকে সংগৃহীত রাজস্বের ভারে কেন্দ্রের ভান্ডার পরিপুষ্ট হয়ে থাকে।

এই রকম একটি মৌল আর্থিক কাঠামো বজায় রেখে পরবর্তীকালে যখন যোজনার দায়ভাগ রাজ্যগুলির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হল, তখনো কাঠামোগত একই ব্যবস্থায় যোজনা সাহায্যের নাম করে যেভাবে সম্পদ বন্টন সম্ভব তার অবশ্যম্ভাবী ফল হোল আঞ্চলিক উন্নয়নের অসাম্য। সারা ভারতে ইতিমধ্যে ছ'টি পঞ্চবার্ষিকী যোজনাও তিনটি বার্ষিক যোজনার কার্যক্রম শেষ হয়েছে কিন্তু যোজনার ফলাফলে বৃটিশ আমলের অঞ্চল ভেদে বৈষয়িক বৈষম্য চৌত্রিশ বছরের পরিকল্পনাতেও দূর করা যায় নি। শুধু তাই নয়, এই বৈষম্য উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এক কালের উন্নত অঞ্চল পরবর্তীকালের বৈষয়িক বিকাশের বিচারে অনুন্নত অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ পশ্চিমবঙ্গ। অষ্টম অর্থ কমিশন পশ্চিম বঙ্গকে সম্প্রতি ঘাটতি বাজেট রাজ্য রূপে ঘোষণা করেছে।

নিমেয়ার যখন সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনমত তার ব্যবস্থাপত্র রচনা করেন তখন তাঁর সামনে কোনে উন্নয়নকামী দেশের আদর্শ তুলে ধরা হয়নি। কেবল কেন্দ্রীয় সম্পদ বন্টনে প্রদেশগুলির প্রশাসনিক বাজেট ঘাটতি মেটাবার উপায় বার করার নির্দেশ ছিল। লক্ষ্য ছিল, কেন্দ্রের সম্পদ সংগ্রহ ব্যবস্থা যেন কোন মতে ব্যাহত না হয়। তবে, কেন্দ্রের সম্পদ সংগ্রহে যদি প্রাদেশিক রাজস্বগত আয় ব্যাহত হয় তাতে আপত্তির কিছু নেই—প্রদেশের আর্থিক ঘাটতি কেন্দ্রের বিচারমত অনুদানে মেটানো যাবে—প্রদেশের চাহিদায় নয়, এই ছিল নির্দেশ। এই ধরনের একটি অর্থ ব্যবস্থার দায় স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৩৭ বছর পরেও একটি উন্নয়নকামী স্বাধীন দেশের অর্থনীতি বহন করে চলেছে সংবিধানে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অভিধা নিয়ে, এটাই পরমাশ্চর্য।

অবশ্য, দ্বিতীয় অর্থ কমিশনের প্রতিবেদনের একাংশে নিমেয়ার ব্যবস্থার উপযোগিতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল এইভাবে যে, 'স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর অর্থনৈতিক বিকাশের কারণে জাতীয় পরিকল্পনার প্রয়োগ শুরু হওয়ায় কেন্দ্র ও রাজ্যের আর্থিক সহযোগিতার পারিপার্শ্বিক বদলে গেছে। এখন কেবল মাত্র কোনো মতে উন্নতমানের প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলাই রাজ্যের

(1) (a) Report of the second Finance Commission, New Delhi, 1957 পৃ ২৩,
(b) Report of the Fourth Finance Commission New Delhi 1965 পৃ ৪৯

বাজেটের দায় নয়–নিমেয়ার ব্যবস্থার যা ছিল মূল লক্ষ্য। এক কালের পুলিশ প্রধান শাসন ব্যবস্থা এখন কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। ফলে সরকারি কাজে কর্মে মৌল পরিবর্তন যেমন এসেছে তেমনি বাজেটের হিসাবে প্রশাসনের আর্থিক দায় দায়িত্ব যথেষ্ট সম্প্রসারিত হয়েছে।'

পুলিশী রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তে নিরন্তর কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করে দ্বিতীয় কমিশন শেষ পর্যন্ত তাদের রায়ে বললেন, 'যাইহোক নিমেয়ার উদ্ভাবিত ব্যবস্থা এখনও উপযোগিতা হারায়নি।'[২] এর পরের অর্থ কমিশনগুলি নিমেয়ার ব্যবস্থার হেরফের ঘটায় নি। কোনো অর্থ কমিশনই সাম্রাজ্যবাদী মৌল পদ্ধতি থেকে সরে আসতে চায়নি। সাংবিধানিক ভাবে সরে আসতে না পারলেও এই পদ্ধতির সমালোচনায় কোনো কমিশনই মুখ খোলে নি। পিঠের ওপর বোঝার ভার যেমন অসহ্য মনে হলেও ভারবাহী গর্দভকে সেই বোঝা বহন করে যেতে হয়, ভারতীয় কল্যাণমূলক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শেষ বোঝাটি এখনো পিঠ ঝাঁকিয়ে ফেলে দিতে পারেনি।[৩]

কেন্দ্রীয় সম্পদ বন্টনের তাৎপর্য ঃ

কেবলমাত্র প্রশাসনিক ফাঁক ভরাট করার দায়িত্ব নিয়ে যে ধরণের আর্থিক সহায়তা কেন্দ্র থেকে অর্থ কমিশন মারফৎ রাজ্যগুলিকে বরাদ্দ করা হচ্ছে তাতে মূলত দেখা যায় আর্থিক দিক দিয়ে উন্নত রাজ্যগুলি ক্রমাগত ভাবে লাভবান হয়ে চলেছে। উল্লেখ করা যায়, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও পাঞ্জাবের প্রসংগ। প্রথম কমিশনের সময়কাল শেষ হলে (১৯৫৬-৫৭) দেখা গেল সব রাজ্যই ঘাটতি বাজেটের কবলে। প্রথম কমিশনের ঐ শেষ বছরে সব রাজ্যের মিলিত ঘাটতির পরিমাণ ৪৬৬ কোটি টাকা।[৪] এর পরের কমিশনগুলির সময়কালে রাজ্যগুলির মিলিতভাবে ঘাটতি বাজেটের চাপে অধিকাংশ সময়ে ভুগতে হয়নি যে কটি রাজ্য উদ্বৃত্ত বাজেটের হিসাবে প্রথম সারিতে রয়েছে তারা হল পাঞ্জাব, অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশ।

রাজ্য বাজেটের ঘাটতি ও উদ্বৃত্ত ঃ

একমাত্র পাঞ্জাব রাজ্যই ধারাবাহিক ভাবে দ্বিতীয় কমিশন থেকে সপ্তম কমিশন পর্যন্ত সময়কালে ধারাবাহিক উদ্বৃত্ত বাজেট রচনার সুযোগ পেয়েছে। জন প্রতি মাথা পিছু আয়ের হিসাবে পাঞ্জাব বর্তমানে প্রথম সারির রাজ্য। এর পরেই উদ্বৃত্ত বাজেট রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছে অন্ধ্র, জম্মু-কাশ্মীর, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশ। এই রাজ্যগুলি ছয়টি কমিশনের মধ্যবর্তী সময়ে চারটির ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত বাজেট রচনা করেছে। এদের মধ্যে কেবল অন্ধ্ররাজ্য বৈষয়িক বিচারে সামান্য উন্নত। তুলনামূলক হিসাবে মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে অন্ধ্র রয়েছে মধ্যবর্তী স্থানে। উপরোক্ত চারটি রাজ্যের মধ্যে বাকী তিনটি রাজ্য মাথাপিছু আয়ের হিসাবে একেবারে নিচু তলার রাজ্য।

বাজেট উদ্বৃত্ত রাখার কৃতিত্বে এদের পরেই রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাট, কেরল, বিহার ও নাগাল্যান্ড। এদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও গুজরাট উচ্চ আয়ের রাজ্য। বিহার ও নাগাল্যান্ড ভারতের দরিদ্রতম রাজ্যগুলির অন্যতম। উদ্বৃত্ত বাজেট রচনার ব্যাপারে বলা চলে দরিদ্র রাজ্যগুলির কৃতিত্বই বোধহয় বেশি। অথচ অর্থ কমিশন গুলির কাছ থেকে তুলনায় দরিদ্র রাজ্যগুলির প্রাপ্তিযোগ বেশি নয়।[৫]

অর্থ কমিশনগুলি থেকে প্রাপ্তি যোগের বিচারে রাজ্যগুলির বাজেট বিশ্লেষণ করার আগে পরবর্তী সারণী ৫.১ লক্ষ্যণীয়। সারণীতে দ্বিতীয় কমিশনের পর থেকে প্রতিটি কমিশনের সময়কালে যে সব রাজ্য উদ্বৃত্ত বাজেট রচনা করেছে তাদের তালিকা লিপিবদ্ধ হোল।

দ্বিতীয় কমিশনের সময়কালে ৯টি উদ্বৃত্ত বাজেট রচনাকারী রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় অর্থ কমিশন থেকে যাদের মাথাপিছু প্রাপ্তিযোগ বেশি ছিল তারা হল মহীশূর (কর্ণাটক), অন্ধ্র, কেরল, পাঞ্জাব ও জম্মু-কাশ্মীর। এই পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে মাথাপিছু আয়ের হিসাবে উঁচু তলার রাজ্য হল পাঞ্জাব ও অন্ধ্র। পাঞ্জাবের স্থান তৃতীয়, অন্ধ্রের অষ্টম। মাথা পিছু স্বল্পআয় সম্পন্ন রাজ্যগুলির যারা দ্বিতীয় কমিশন থেকে মাথাপিছু প্রাপ্তি যোগ কম থাকা সত্ত্বেও উদ্বৃত্ত বাজেট তৈরি করেছে, তারা হল উত্তর প্রদেশ, বিহার ও মধ্যপ্রদেশ।

এইভাবে ষষ্ঠ কমিশন পর্যন্ত হিসাব নিলে দেখা যাবে যে কমিশনগুলি থেকে বেশি পাওয়া বা কম পাওয়ার ওপর উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি বাজেট রচনা করা নির্ভর করেনি। দরিদ্র রাজ্যগুলি মাথাপিছু হিসাবে কম পেয়েও অনেক ক্ষেত্রে বার্ষিক বাজেট উদ্বৃত্ত রেখেছে। এর একমাত্র কারণ হল বহু প্রয়োজনীয় উন্নয়নশীল কাজে দরিদ্র রাজ্যগুলি বাজেট নির্ধারিত সম্পদ ব্যবহার করতে পারেনি–সম্পদে সংকুলান হয়নি। পরিবর্তে ঐ সব কাজে কর্মে সম্পদ ব্যবহার করলে সাধারণভাবে বাজেট উদ্বৃত্ত থাকতো না। পরবর্তী সারণীতে বাজেট রচনাকারী রাজ্যগুলিকে মাথাপিছু আয়ের হিসাবে (ব্র্যাকেটে উল্লিখিত সংখ্যাদ্বারা চিহ্নিত) ও কমিশনগুলি থেকে মাথাপিছু প্রাপ্তিযোগের হিসাবে সাজিয়ে দেওয়া হল ঃ (সারণী ৫·২)

এ পর্যন্ত কমিশনগুলি থেকে রাজ্যগুলির প্রাপ্তিযোগের হিসাব পর্যালোচনা করে দেখলে জানা যাবে অপেক্ষাকৃত গরীব রাজ্যগুলি পরিমাণে কম পেয়ে এসেছে। একমাত্র সপ্তম কমিশনে এর কিছুটা ব্যতিক্রম পাওয়া যাবে। সপ্তম কমিশনের সম্পদ বন্টনে মাথাপিছু প্রাপ্তিযোগের বিচারে প্রথম ছ'টি রাজ্য হল হিমাচল, জম্মু-কাশ্মীর, ওড়িশা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশ। এদের মধ্যে হিমাচল বাদে বাকী পাঁচটি রাজ্য মাথাপিছু আয়ের হিসাবে (১৯৭৮) পর্যায়ক্রমে বিহার সপ্তদশ স্থানে, উত্তরপ্রদেশ ষোড়শ স্থানে, মধ্যপ্রদেশ পঞ্চদশ স্থানে, ওড়িশা ত্রয়োদশ স্থানে, জম্মুকাশ্মীর দ্বাদশ স্থানে ছিল। অথচ ছ'টি কমিশনের সময়কালে উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, জম্মুকাশ্মীর চারটি কমিশনের সময়ে। বিহার ৩টি কমিশনের সময়ে বার্ষিক বাজেট উদ্বৃত্ত রাখতে পেরেছে। কিন্তু মাথাপিছু মানুষের আয় বাড়াতে পারেনি। বাজেটের খেলায় রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় সরকারকে খুশি রাখতে পারলেও সাধারণ মানুষের স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি বা রাজ্যের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমর্থ হয়নি।

এ পর্যন্ত কমিশনগুলির হিসাবে ধনীরাজ্যগুলির ভাগ্যে যখন বেশি সম্পদ প্রাপ্তি ঘটেছে, ফলে অপেক্ষাকৃত ধনী রাজ্যগুলি রাজ্যের উন্নয়নশীল প্রকল্পে কিছু না কিছু খরচ করে রাজ্যের বর্ধিত আয়ের সংস্থানটি কোন রকমে বজায় রাখতে পেরেছে। এসবের ফলে রাজ্যগুলির বৈষয়িক উন্নয়নের কোন পর্যায়গত তারতম্য ঘটেনি। পরবর্তী সারণী পর্যালোচনা করলে কমিশনগুলির সময়কালের হিসাবে দীর্ঘ আঠারো বছর (১৯৫০-১৯৭৮) রাজ্যগুলির অপরিবর্তিত বৈষয়িক অবস্থা উপলব্ধি করা যাবে।

রাজ্যগুলির বাজেটে ঘাটতি পূরণের মহান উদ্দেশ্য অর্থকমিশনগুলির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বলে স্বীকৃত। কিন্তু বাজেটের নিছক ঘাটতি দমনে বা উদ্বৃত্ত সৃষ্টিতেই যে রাজ্যের মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতা বা রাজ্যের সার্বিক

---

১. Report of the second Finance Commission, New Delhi, 1957 পৃ ২২

২. তদেব।

আমাদের পরিকল্পনাকারী অর্থশাস্ত্রীরা, স্বাধীনতাপ্রিয় রজনীতিবিদরা, অর্থকলমিশনের সুযোগ্য সদস্যগণ যে সমস্যা এড়িয়ে গেছেন সযত্নে, সেটি প্রকৃত অর্থনীতিবিদের চোখ এড়াতে পারেনি। ভারতীয় যোজনার আলোচনায় খ্যাতনামা অর্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক হ্যানসন মুচকি হেসে বা কটাক্ষ করে আমাদের শুনিয়েছেন ঃ

'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিযুক্ত এক্সপার্টদের বিশ্লেষণ, যেগুলি পাওয়া গিয়েছে ১৯২০ সালের মেস্টন কমিটির রিপোর্টে, ১৯২১ সালে পীল কমিটি, ১৯৩৫-এর পার্সী কমিটি, ১৯৩৫-এর দ্বিতীয় পীল কমিটি এবং সবশেষে নিমেয়ার ব্যবস্থা মারফৎ তারই ওপর নির্ভর করেই স্বাধীন ভারত সরকার কেন্দ্র সংগৃহীত রাজস্ব থেকে রাজ্যগুলির জন্য আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করে'।

A H Haison, The Process of Planning. OUP. London 1965, পৃ ৩২১

৪ সারণী ৫·৩

(১) পরিশিষ্ট–মাথাপিছু আয় ও কেন্দ্রীয় সম্পদের প্রাপ্তিযোগ

উন্নয়ন বৃদ্ধি পাবে এমন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। রাজ্যের রাজস্বগত ব্যয়ের আসল প্রয়োজনীয়তা কী, অর্থাৎ, কী পরিমাণ সম্পদ সংগৃহীত হলে রাজ্যগুলি অতিমাত্রায় ঋণ না করে রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যয় মেটাতে সক্ষম হবে সেটাই বিচার করা দরকার। রাজ্য ও কেন্দ্রের বাজেট সমীক্ষা করে আমরা কি দেখি?

সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে রাজস্ব সংগ্রহে রাজ্যগুলি যে অমনোযোগী বা ব্যর্থ সেকথা সপ্তম কমিশন স্বীকার করেনি। সপ্তম কমিশন ১৯৭০-৭১ সাল থেকে ৭৭-৭৮ পর্যন্ত এক হিসাবে দেখিয়েছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে নিজস্ব এক্তিয়ারের মধ্যে পাওয়া রাজস্ব সম্পদ বৃদ্ধি করে চলেছে রাজ্য সরকারগুলিও অনুরূপভাবে নিজস্ব আদায় বৃদ্ধি সম্ভব করে তুলেছে।[১] ঐ হিসাব থেকে জানা যাচ্ছে যে সারা দেশে যত পরিমাণ রাজস্ব ও কর সংগৃহীত হয় তার দুই তৃতীয়াংশ সংগ্রহ করতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারগুলি বাকী এক তৃতীয়াংশ।

রিজার্ভ ব্যাংক প্রদত্ত '৮০-'৮১ সাল পর্যন্ত এই হিসাবের নড়চড় দেখা যাচ্ছে না। ৫·৩ সারণী লক্ষ করলেই রাজ্য ও কেন্দ্রের সম্পদ সংগ্রহের সীমা পরিষ্কার বোঝা যাবে।

৫·৩ সারণী থেকে জানা যাচ্ছে রাজ্যগুলি রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারে সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও সমভাবে সংগ্রহ বাড়িয়ে চলেছে। এই সঙ্গে রাজ্যগুলির সম্পদ সংগ্রহের সঙ্গে রাজস্বগত ব্যয়ের তুলনামূলক হিসাব নিলে দেখা যাবে যে কী পরিমাণ ব্যয় জনিত ঘাটতির দায় মাথায় নিয়ে রাজ্যগুলিকে সম্পদ সংগ্রহ করতে হয়। রাজ্যগুলির নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহ যে পরিমাণ, ব্যয়ের দায়িত্ব তার চেয়ে অনেক বেশি–পক্ষান্তরে কেন্দ্রের রাজস্বগত ব্যয় তার রাজস্বগত আয়ের থেকে কম। রাজ্যগুলি নিজস্ব আয় থেকে ব্যয় যে বেশি হবে এটি সংবিধান নির্দেশিত ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা বৃটিশ আমল থেকেই চলে আসছে। নিচের সারণীতে ১৯৭৪-৭৫ সাল থেকে ১৯৮০-৮১ সাল পর্যন্ত রাজ্যগুলির রাজস্ব ও কর সংগ্রহজাত আয় এবং রাজস্বগত ব্যয়ের একটি হিসাব তুলে ধরা হলঃ (সারণী ৫·৪)

রাজ্যগুলির বার্ষিক ব্যয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আপত্তিকর হল মিলিতভাবে রাজ্যগুলির ব্যয়ের পরিমাণ কেন্দ্রের চেয়ে বেশি। সারাদেশে কেন্দ্র ও রাজ্য মিলিতভাবে যা ব্যয় করে তার মধ্যে কেন্দ্রের দায়িত্বে রয়েছে গড়পড়তায় ৪৫ শতাংশ–রাজ্যের দায়িত্বে রয়েছে ৫৫ শতাংশ। ৫·৫ সারণী লক্ষ্য করলেই কেন্দ্র ও রাজ্যের ব্যয়ের তারতম্য বোঝা যাবে।

ওপরের তথ্যে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রের চেয়ে রাজ্যগুলির প্রশাসনিক খরচের দায় বেশি। কিন্তু আয় কম। অথচ স্বল্প খরচের দায় থাকলেও নানাভাবে কেন্দ্রের আয় বেশি। ঔপনিবেশিক যুগের বৃটিশ অনুশাসন অনুসরণ করে আমাদের সংবিধানে এই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্র থেকে যেভাবে রাজ্যগুলির নিজস্ব সম্পদ আহরণের অধিকার খর্ব করে রাখা হয়েছে তাতে দেখা যায় শেষ পর্যন্ত রাজ্যগুলির সার্বিক দেনার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বৃটিশ যুগের নীতিতে কেবলই প্রদেশগুলির প্রশাসন ব্যয় জনিত বাজেট ঘাটতি রোধ করার ব্যবস্থা হিসাবেই প্রচলিত হয়েছিল কেন্দ্র থেকে রাজস্ব বন্টন ব্যবস্থা। কিন্তু ব্যবস্থা হিসেবে এটি বর্তমানে উন্নয়নকামী আর্থিক পরিকল্পনায় অংশগ্রহণকারী দেশের আর্থ-ব্যবস্থা হিসাবে একেবারেই অকেজো। অর্থ কমিশনগুলির সুপারিশজাত সম্পদ বন্টনের ব্যবস্থায় রাজ্যগুলির বাজেট সংক্রান্ত ফলাফল বিচার করলেই কমিশন অনুসৃত রীতি পদ্ধতির অসারতা ধরা পড়বে।

১. Report of the Seventh Finance Commission, New Delhi, 1978, পৃ: ৭৯

১৯৫২ সালে প্রথম অর্থ কমিশনের রিপোর্ট বেরোয়। ঐ বছর থেকেই অর্থ কমিশনজাত সুপারিশ কার্যকর হতে থাকে। প্রথম অর্থ কমিশনের সুপারিশমত কেন্দ্র থেকে অর্থ বন্টনের ফলে যা অনুমান করা হয়েছিল তা হয়নি। ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত প্রথম কমিশনের সুপারিশ কার্যকর ছিল। দেখা গেল ১৯৫২ থেকে পাঁচ বছরে ১৯৫৭ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময়কালে রাজ্যগুলির মিলিত বাজেট ঘাটতি ৪৬৬ কোটি টাকায় পৌঁছে যায়। অর্থ কমিশনের হিসাব ছিল ঘাটতি হবে ১৪.০৫ কোটি টাকা মাত্র। স্বভাবতই এই ঘাটতি মেটাতে বাড়ে রাজ্যগুলির ঋণের পরিমাণ (সারণী ৫.৬ ও পরিশিষ্ট সারণী লক্ষণীয়)

১৯৬০ সালের জুন মাসে দ্বিতীয় অর্থ কমিশন বসে। সেই বছরেই ৩১ মার্চ কেন্দ্রের কাছে রাজ্যগুলির ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৭৬ কোটি টাকা। অর্থ কমিশন সুপারিশ মত আর্থিক সহায়তা পেয়েও প্রতি বছর রাজ্য ব্যয় নির্বাহের জন্য কেন্দ্রের জন্য রাজ্যগুলির ঋণের বহর বেড়েই চলেছে। সাংবিধানিক ব্যবস্থামত কেন্দ্র প্রদত্ত ঋণও রাজ্যগুলিকে সহায়তা দানের অন্তর্গত। কিন্তু ঋণজনিত দুরাবস্থা চরমে ওঠে যখন রিজার্ভ ব্যাংক রাজ্যগুলির প্রয়োজনীয় ওভার ড্রাফ্ট দিতে অস্বীকার করে।

দ্বিতীয় অর্থ কমিশনের (১৯৫৭-৫৮ থেকে ৬১-৬২) সুপারিশের পর্যায়ে দেখা গেল অধিকাংশ রাজ্যই কিছুকালের জন্য বাজেট ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। তৃতীয় কমিশনের পরবর্তী পর্যায়ে (১৯৬২-৬৩ থেকে ১৯৬৫-৬৬) সেই রাজ্যগুলিই আবার উদ্বৃত্ত বাজেট রচনা করতে পেরেছে। যদিও ঐ দুটি কমিশনের ভবিষ্যৎ হিসাবের অঙ্কে রাজ্যগুলির বাজেট ঘাটতি কাটিয়ে ওঠার কথা বলা ছিল না। ঐ দুটি কমিশনের হিসাবেই বলা হয়েছিল সুপারিশমত সম্পদের ভাগ পেলেও সবকটি রাজ্যের পরবর্তী পর্যায়ে আয়ে ও ব্যয়ে সঙ্কুলান না ঘটে অল্প পরিমাণ বাজেট ঘাটতি থাকবে। দ্বিতীয় কমিশনের অনুমানে রাজ্যগুলির মিলিত বাজেট ঘাটতি ৩৬.৭০ কোটি টাকা ও তৃতীয় কমিশনের অনুমানে ৬১ কোটি টাকা হবার কথা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল দুটি কমিশনের সুপারিশজাত সম্পদের ভাগ পেয়ে রাজ্যগুলির মিলিত বাজেটে উদ্বৃত্ত ঘটেছে যথাক্রমে ১২৮ কোটি ও ৩১৩ কোটি। শেষ পর্যন্ত বার্ষিক হিসাবের অঙ্কে অধিকাংশ রাজ্যের ক্ষেত্রে বাজেট ঘাটিত চাপা দিতে পারা গেলেও রাজ্যগুলির ঋণের পরিমাণ কিন্তু বাড়তে থাকে।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্যগুলির মোট ঋণের পরিমাণ ছিল মাত্র ৪৪ কোটি টাকা। ১৯৫২ সাল থেকে অর্থ কমিশন বসে। তার আগে কেন্দ্র থেকে সম্পদ বন্টনের জন্য দুটি সুপারিশ কার্যকর করা হয়–একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা নামে পরিচিত অন্যটি দেশমুখ সুপারিশ। দুটি সুপাশিই অকাজের বলে প্রমাণিত হয়েছে, কারণ এই সময় থেকেই রাজ্যগুলির সার্বিক ঋণ যে হারে বাড়তে থাকে তাকে রোধ করার ব্যবস্থা এই দুটি সুপারিশে ছিল না–যার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত ঋণ একটা বড় অংশ। ঋণের ক্রম বিবর্তনে আঙ্কিক পরিমাণের প্রসঙ্গে পরে আসছি–তার আগে বাজেট প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা দরকার।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় কমিশনের কালে রাজ্য বাজেটে মোট উদ্বৃত্ত সঞ্চয়ের পর চতুর্থ কমিশনের সুপারিশে (১৯৬৬-৬৭) কেন্দ্র থেকে ১৯৬৮-৬৯) কেন্দ্র থেকে রাজস্ব সম্পদের ভাগ পেয়েও রাজ্যগুলির বাজেট আর উদ্বৃত্ত রইলো না। মোট ঘাটতি দাঁড়ালো ১৪৯ কোটি টাকার মত। অবশ্য ঐ সুপারিশের নীট ফল যে বাজেট ঘাটতি কমবে এমন কথা কমিশনের হিসাবে ছিল না। ধরা ছিল আরও বেশি ঘাটতির অঙ্ক। প্রায় ১৭৪ কোটি টাকা। কিন্তু রাজ্যগুলি যে কোনো কারণেই হোক বাজেটের ঘাটতি কমিয়ে আনতে পেরেছিল। তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কমিশনের কালে উদ্বৃত্ত সৃষ্টির পর চতুর্থ কমিশনের সুপারিশে আবার ঘাটতির দেখা, এটাই লক্ষ্যণীয়।

পঞ্চম কমিশনের (১৯৬৯-৭০) থেকে ১৯৭৩-৭৪) সুপারিশের প্রতিক্রিয়ার হিসাবে জানানো হয়েছিল সম্মিলিত বাজেটে ঘাটতি থাকবে না,

মোট উদ্বৃত্ত থাকবে ৬৩৩ কোটি টাকা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মোট ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৩০৪ কোটি টাকা। এই সময় থেকেই কেন্দ্রের কাছে অবাঞ্ছিত, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে রাজ্যগুলির নেওয়া ওভার ড্রাফটের পরিমাণ বাড়তে থাকে। চতুর্থ যোজনার মুখোমুখি সময়ে (১৯৬৯) রাজ্যগুলির ওভার ড্রফটের পরিমাণ ছিল ১৪৫ কোটি টাকা।[1] ঐ পঞ্চম কমিশনের কালেই ১৯৭১ সালে রাজ্যগুলির ওভার ড্রাফটের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৩৭০ কোটি টাকা।[2] সেই বছরেই কেন্দ্রের কাছে রাজ্যগুলির ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৩৬৫ কোটি টাকা।[3]

রাজ্যের ওভার ড্রাফট সাধারণত তিন মাসের মধ্যেই পরিশোধনীয় কিন্তু রাজ্যগুলির আয়ব্যয়ের সংকুলান না হওয়ায় ঋণসহ ওভার ড্রাফটের পরিমাণও বাড়তে থাকে। এইভাবে সকল রাজ্যগুলির আর্থিক দুর্দৈবের ধারাবাহিক ঘটনা অর্থ কমিশনের আপাত ব্যর্থতার কথাই প্রমাণ করে। পঞ্চম কমিশনের কাছে সুপারিশ চাওয়া হয়েছিল কীভাবে রাজ্যগুলির ওভার ড্রাফট কমানো যায়। কমিশন সংবিধানের এক্তিয়ারের মধ্যে থেকে যতটুকু বলা যায় সেই নির্দেশ দেয়।

কমিশনের সুপারিশ ছিল কেন্দ্রের কাছ থেকে রাজ্যের পাওনা অর্থ পেতে যেন দেরী না হয়। রাজ্যগুলির নিজস্ব ঋণ সংগ্রহের সুবন্দোবস্ত যেন থাকে। রাজ্যগুলি অপারগ হলে রাজ্যের অর্থিক সহায়তায় কেন্দ্রীয় সরকারকে তৎপর হতে হবে। কমিশনের সুপারিশমত যে কাজ হয়নি পরে ঘটনাবলী থেকে তা জানা যাচ্ছে। রাজ্যের প্রাপ্য অর্থ সময়মত পৌঁছে দেওয়া হয় না। এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে রাজ্যগুলির পক্ষ থেকে প্রায়ই অভিযোগ শোনা যায়। কেন্দ্রের তুলনায় রাজ্যের নিজস্ব ঋণ সংগ্রহের ক্ষমতা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর একটা অনিষ্টকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা হ'ল রিজার্ভ ব্যাংক থেকে নেওয়া ওভার ড্রাফটের পরিমাণ বেড়ে গেলে তার কিছু অংশ মধ্যমেয়াদী ঋণে পরিণত করে দেওয়া হতে থাকে—অপারগ রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে যেগুলি দান হিসেবে মকুব করে দেওয়ার দরকার ছিল। এতে ওভার ড্রাফটের পরিমাণ কমে যায় বটে কিন্তু রাজ্যগুলির মেয়াদি ঋণের পরিমাণ বাড়ে।

ষষ্ঠ কমিশনের সুপারিশের কার্যকাল শেষ হয় ১৯৭৯ সালের মার্চে। সেই বছরেই জানা গেল ষষ্ঠ কমিশনের সুপারিশমত অনুদান পেয়ে রাজ্যগুলির ১৯৭৯ পর্যন্ত পাঁচ বছরের মিলিত বাজেটে ৩৯৯১ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হয়েছে। অথচ ষষ্ঠ কমিশনের অনুমাণ ছিল রাজ্যগুলির মিলিত বাজেটে মাত্র ৩৩৩ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি থাকবে। একটা ব্যাপার লক্ষ্যণীয় যে ষষ্ঠ কমিশনের সময় কালে রাজস্ব বিভাজন ও কেন্দ্রীয় দান থেকে রাজ্যগুলি পায় ১১,১৬৮ কোটি টাকা। পরিমাণটি আগের কমিশনের সুপারিশ থেকে ৫ হাজার কোটি টাকা বেশি। সম্ভবত এই বাড়তি সম্পদের জোরে ঘাটতি এড়ানো গেছে কিন্তু রাজ্যগুলির মিলিত ঋণের পরিমাণ কামনো যায়নি। ১৯৭৯ সালের ৩১ মার্চ কেন্দ্রের কাছে রাজ্যগুলির ঋণ সঞ্চিত হয়েছে ১৩৮৯০ কোটি টাকা। এই কমিশনের প্রথম দুবছরে গড়ে ৫০০ কোটি টাকা হিসাবে বছরে ঐ ঋণ সঞ্চিত হয়েছে। শেষ তিন বছরে গড়ে হাজার কোটি টাকা হিসাবে।

১৯৭৯ সাল থেকে শুরু হয় সপ্তম কমিশনের সময়কাল। এই কমিশনের সুপারিশে রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের দেয় রাজস্ব ভাগ ও অনুদান নিয়ে মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ২০,৮৪৩ কোটি টাকা। ঐ কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল সুপারিশমত কেন্দ্রীয় সম্পদের ভাগ পেলে রাজ্যগুলিরে বাজেটে ঘাটতি দেখা দেবে না। উদ্বৃত্ত হবে মোট ১২,৪০৯ কোটি টাকা। কিন্তু বাস্তবে কমিশনের সময়কালে (১৯৭৯-৮০ থেকে ১৯৮৩-৮৪) রিজার্ভ ব্যাংক প্রদত্ত তথ্যের অনুসরণে অনুমান করা যাচ্ছে ১৯৮৪ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত মোট বাজেট ঘাটতি ৩৫০০ কোটি টাকার মত হতে পারে।

(১) S Vesnu, The Finance Commission of India, Madras 1978, পৃ ৯২
(২) তদেব (৩) পরিশিষ্ট

রিজার্ভ ব্যাংক বুলেটিনে প্রদত্ত বছর বছর বাজেট ঘাটতির তথ্য সংগ্রহ করে দেখা যায় সকল রাজ্যের বিগত পাঁচটি বছরের মিলিত বাজেটে কোনো উদ্বৃত্ত নেই। এমনকি বহুবার উদ্বৃত্ত বাজেট রচয়িতা পাঞ্জাব রাজ্য তৎসহ মধ্যপ্রদেশ, বিহার, গুজরাট, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ বাজেট ঘাটতি থেকে মুক্তি পায় নি। অথচ এই কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল কেবলমাত্র ছ'টি রাজ্য হিমাচল, জম্মু-কাশ্মীর, মণিপুর, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, ওড়িশা কমিশনের সুপারিশমত কেন্দ্রীয় সম্পদের ভাগ পেয়েও ঘাটতি বাজেট এড়াতে পারবে না কারণ কমিশন স্বীকার করেছেন এই সব রাজ্যের কর ও রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতা যথেষ্ট সীমিত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল কমিশনের হিসাবে রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতা যাদের সীমিত নয় শেষ পর্যন্ত তারাও ঘাটতি বাজেট রাজ্যের দলে যোগ দিল।

এ তাবৎ কাল কমিশনের হিসাব মত সুপারিশ পেয়ে কখনো রাজ্যগুলির মিলিত বাজেট উদ্বৃত্ত হচ্ছে, কখনো ঘাটতি থাকছে। এই হিসাবে অবশ্যই রাজ্যগুলির প্রকৃত আর্থিক অবস্থা অনেকটা লটারির খেলার মত। বাজেট ঘাটতির কারণ হিসাবে যদি অর্থ কমিশনের সুপারিশের স্বল্পতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা যায় তাহলেও আরো বলার থাকে। কেবল বাজেটের আঙ্কিক প্রতিক্রিয়াই নয় রাজ্যগুলির ক্রমবর্ধিত ঋণের দায়ও কমিশনের সুপারিশগুলির উপর চাপে।

রাজ্যঋণের চাপ

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্যগুলির মোট ঋণের পরিমাণ ছিল মাত্র ৪৪ কোটি টাকা। এর পর রাজ্যগুলিকে সাহায্যের নামে অর্থ কমিশনের ব্যবস্থা হল। এক একটি কমিশন রাজ্যগুলিকে প্রশাসনিক ব্যায়ের জন্য রাজস্বের ভাগ ও অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা পত্র দিতে লাগলেন। কিন্তু ফলত: সাহায্যের নামে যে স্বল্প পরিমাণ সম্পদ বন্টনের ব্যবস্থা হল রাজ্যগুলির মোট ব্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে তাতে রাজ্যগুলির মোট ঋণের পরিমাণ বাড়তে থাকে, এই ঋণের বড় অংশই হল কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের ঋণ।

প্রথম কমিশনের শেষ বছরে ১৯৫৭ সালের মার্চে রাজ্যগুলির মোট ঋণ সঞ্চিত হয় ১৪৮৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ঋণ প্রায় ১০৯৫ কোটি টাকা। দ্বিতীয় কমিশনের সময়কাল শেষ হয়েছে ১৯৬২ সালের মার্চে। সেই বছরে রাজ্যগুলির মোট ঋণের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ালো ৩১৪৭ কোটি টাকা—কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ঋণ ২৩১৪ টাকা। এই ভাবে ঋণ বেড়ে চতুর্থ কমিশনের শেষ বছরে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের ঋণ সঞ্চিত হয় ৪০৯৪ কোটি টাকা—যখন রাজ্যগুলির সব সূত্র মিলিয়ে মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৫৫১১ কোটি টাকা।

কেন্দ্র থেকে সম্পদের ভাগ পাওয়া যাচ্ছে আর রাজ্যের ঋণ বাড়ছে প্রায় ম্যাজিকের মতই। বিশ্বের আর কোনো ফেডারেল রাজ্যে এই ধরনের ঘটনা নেই। পঞ্চম কমিশনের শেষ বছরে রাজ্যগুলির মোট ঋণ দাঁড়ালো ১১৫৮০ কোটি টাকা, কেন্দ্রের কাছে ঋণ জমলো ৮৫৭৯ কোটি টাকা। ষষ্ঠ কমিশনের শেষ বছরে (১৯৭৯) মোট ঋণ ১৯১৩৯ কোটি টাকা—কেন্দ্রের কাছে ঋণের পরিমাণ ১৩৮৯০ কোটি টাকা।

প্রথম অর্থ কমিশনের পর কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের ঋণ বেড়েছিল এক হাজার কোটি টাকার কিছু বেশি, দ্বিতীয় কমিশনের পর প্রায় ১২০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি। তৃতীয় কমিশনের চার বছরে ১৭০০ কোটি টাকা ঋণ বৃদ্ধি। চতুর্থ কমিশনের তিন বছরে বৃদ্ধি ১৫০০ কোটি টাকা। পঞ্চম কমিশনের শেষে দেখা গেল ঋণ বেড়েছে আরো ৩০০০ কোটি টাকা। ষষ্ঠ কমিশনের শেষে কেন্দ্রের কাছে মোট ঋণের পরিমাণ ১৩৮৯০ কোটি টাকা, অর্থাৎ পাঁচ বছরে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের মোট ঋণ বেড়েছে ৫০০০ কোটি টাকার ওপর।

কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের ঋণ ও কেন্দ্রীয় রাজস্বভাগ প্রাপ্তির তুলনামূলক হিসাব নিলে দেখা যাবে যে প্রথম কমিশন থেকে দ্বিতীয় কমিশনের

সুপারিশজাত সম্পদ বন্টন বেড়েছিল ৬০০ কোটি টাকার মতো। কিন্তু ঐ সময়ে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের ঋণ বেড়েছিল ১২০০ কোটি টাকা। এইমত দ্বিতীয় কমিশন থেকে তৃতীয় কমিশনের সম্পদ বন্টনের সুপারিশ যা বাড়ে তার পরিমাণ ৩০০ কোটি টাকারও কম। কিন্তু ঐ কালে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের ঋণ বেড়েছে ১৭০০ কোটি টাকার বেশি। চতুর্থ কমিশনের সুপারিশের ফলে তৃতীয় কমিশনের চেয়ে রাজ্যগুলির প্রাপ্য বেড়েছিল ৪০০ ক্যোটি টাকার মতো। কিন্তু কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের ঋণ বৃদ্ধি ঘটে ১৫০০ কোটি টাকার মতো। চতুর্থ থেকে পঞ্চমের সুপারিশে রাজ্যগুলি কেন্দ্রের কাছ থেকে ৩৪০০ কোটি টাকা বেশি পরিমাণ সম্পদ পেয়েছে, কিন্তু ঋণ জমেছে আরো ৩০০০ কোটি টাকা। পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ কমিশনের সুপারিশে রাজ্যগুলির বাড়তি প্রাপ্য ঘটেছে ৪০০০ কোটি টাকা কিন্তু ঐ কালে কেন্দ্রের কাছে ঋণ বৃদ্ধি ৫০০০ কোটি টাকারও বেশি। সপ্তম কমিশনের শেষ বছর ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত ঋণের সঠিক পরিমাণ এখনো জানা যায় নি। তবে ১৯৮১ পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাংকের দেওয়া এক হিসাব থেকে জানাযায় ভারতের রাজ্যগুলির মোট ঋণের পরিমাণ ২৪ হাজার ২৫৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে কেন্দ্রের দেওয়া ঋণ ১৭ হাজার ৩২০ কোটি টাকা।

ঋণের জন্য কেন্দ্রের সুদ প্রাপ্তি ঘটে রাজ্যগুলি থেকে। রাজ্য গুলির প্রদত্ত সুদ আর কেন্দ্র থেকে রাজ্যের প্রাপ্তি যোগের হিসাব নিলে কি চিত্র আসে সেটাও জানা দরকার।

তৃতীয় কমিশনের সময় থেকে (১৯৬২) রাজ্যগুলির ঋণ দ্রুত পরিমাণে বাড়তে থাকে। কেন্দ্র থেকে সম্পদ বন্টন যে ভাবে হয় তাতে রাজ্য ঋণের সুরাহা হবার সুযোগ নেই। ইতিমধ্যে দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হয়েছে কিন্তু রাজ্যগুলির নিজস্ব সম্পদ উৎপাদন ক্ষমতা প্রত্যাশিত পরিমাণে বাড়েনি। কেন্দ্র থেকে সম্পদ ভাগের সংবিধান সম্মত ব্যবস্থা রাজ্যগুলির পক্ষে যে অনুকূল নয় রাজ্যগুলি ক্রমবর্ধিত হারে ঋণ বৃদ্ধি সেটাই প্রমাণ করে।

তৃতীয় কমিশনের সুপারিশে রাজ্যগুলির মোট প্রাপ্তিযোগ ছিল ১৩১০ কোটি টাকা কিন্তু ঐ কমিশনের বছরগুলিতে (১৯৬২-৬৩ থেকে ১৯৬৫-৬৬) রাজ্যগুলি কেন্দ্রের ঋণজাত সুদ মিটিয়েছে ৪৫৫ কোটি টাকা ফলে কেন্দ্র থেকে রাজ্যের প্রাপ্তি যোগ কমে যায় ৮৫০ কোটি টাকার কিছু বেশি।

চতুর্থ কমিশনের বছরগুলিতে রাজ্যগুলি কেন্দ্রের সুদ মিটিয়েছে ৬২৫ কোটি টাকা। কেন্দ্র থেকে প্রাপ্য ছিল ১৭৮২ কোটি টাকা কিন্তু দেয় সুদের দরুণ প্রাপ্তি যোগ কমে দাঁড়ায় ১১৫০ কোটি টাকার মত।

পঞ্চম কমিশনের বছরগুলিতে রাজ্যগুলি কেন্দ্রকে সুদ দিয়েছে ১৬৬০ কোটি টাকা ফলে কেন্দ্র থেকে মোট প্রাপ্তিযোগের ৫৪২১ কোটি টাকা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৩৮০০ কোটি টাকা।

ষষ্ঠ কমিশনের সময়কালে সুপারিশমত প্রাপ্য ছিল ১১১৬৮ কোটি টাকা- এর থেকে কেন্দ্রের সুদ ২৫১৩ কোটি টাকা বাদ দিয়ে রাজ্যগুলির প্রাপ্য দাঁড়ায় ৮৬৫৫ কোটি টাকা। যে কালে কেন্দ্র থেকে রাজ্যের নীট প্রাপ্তিযোগ ৮৬৫৫ কোটি টাকা মাত্র সেই সময়ে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের ঋণ সঞ্চিত হয়েছে ১৩৮৯০ কোটি টাকা। রাজ্যগুলির প্রাপ্যের চেয়ে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের ঋণের পরিমাণ বেশি।

রাজ্যের প্রশাসনিক দায় মেটাতে গিয়ে কেন্দ্রের ব্যবস্থার এই পরিণতি আশ্চর্যজনক নয়। এককালের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার অনুসরণ উন্নয়নকামী স্বাধীন দেশে যদি বলবৎ থাকে তাহলে এর চেয়ে উন্নত অবস্থা আর কি হবে?

সারণী ৫.১

উদ্বৃত্ত বাজেট রচনাকারী রাজ্য সমূহ

দ্বিতীয় কমিশনের সময়কাল	তৃতীয় কমিশনের সময়কাল	চতুর্থ কমিশনের সময়কাল	পঞ্চম কমিশনের সময়কাল	ষষ্ঠ কমিশনের সময়কাল
অন্ধ্র	অন্ধ্র	গুজরাট	অন্ধ্র	অন্ধ্র
বিহার	বিহার	জম্মু-কাশ্মীর	হরিয়ানা	আসাম
জম্মু-কাশ্মীর	গুজরাট	কেরল	কর্ণাটক	বিহার
কেরল	জম্মুকাশ্মীর	নাগাল্যান্ড	মধ্যপ্রদেশ	গুজরাট
মধ্যপ্রদেশ	মধ্যপ্রদেশ	পাঞ্জাব	নাগাল্যান্ড	হরিয়ানা
মহীশূর	মহারাষ্ট্র	তামিলনাড়ু	পাঞ্জাব	জম্মু-কাশ্মীর
পাঞ্জাব	পাঞ্জাব	উত্তর প্রদেশ	উত্তর প্রদেশ	কেরল
উত্তর প্রদেশ	উত্তর প্রদেশ			মধ্যপ্রদেশ
পশ্চিমবঙ্গ	পশ্চিমবঙ্গ			মহারাষ্ট্র
				মণিপুর
				মেঘালয়
				নাগাল্যান্ড
				ওড়িশা
				রাজস্থান
				পাঞ্জাব
				ত্রিপুরা
				পশ্চিমবঙ্গ

সারণী ৫.২

বিভিন্ন অর্থ কমিশনের সময়কালে উদ্বৃত্ত বাজেট রচনাকারী রাজ্যগুলির তথ্য

		মাথাপিছু কম প্রাপ্তি	মাথাপিছু বেশি প্রাপ্তি
প্রথম অর্থ	মাথা পিছু বেশি আয়	পশ্চিমবঙ্গ (২)	অন্ধ্র(৮) পাঞ্জাব (৩)
কমিশন	মাথা পিছু কম আয়	উত্তর প্রদেশ (১৪) বিহার (১৬) মধ্যপ্রদেশ (১১)	জম্মু-কাশ্মীর(১৫) কেরল (১০) মহীশূর (৯)
দ্বিতীয় অর্থ কমিশন	মাথা পিছু বেশি আয়	পশ্চিমবঙ্গ (৩) গুজরাট (৪)	অন্ধ্র(৮) পাঞ্জাব(২) মহারাষ্ট্র(১)
	মাথা পিছু কম আয়	উত্তর প্রদেশ(১৫) বিহার (১৬) মধ্য প্রদেশ(১২)	জম্মু-কাশ্মীর(১৩)
চতুর্থ অর্থ কমিশন	মাথা পিছু বেশি আয়	গুজরাট(৩) তামিলনাড়ু পাঞ্জাব(১)	কেরল(৫)
	মাথা পিছু কম আয়	উত্তর প্রদেশ (১১)	জম্মু-কাশ্মীর(১৩)
পঞ্চম অর্থ	মাথা পিছু বেশি আয়	হরিয়ানা(২) পাঞ্জাব(১)	
কমিশন	মাথা পিছু কম আয়	অন্ধ্র(১১) কর্ণাটক(১০) উত্তর প্রদেশ(১২) মধ্যপ্রদেশ(১৪)	
ষষ্ঠ অর্থ কমিশন	মাথা পিছু বেশি আয়	গুজরাট (৪) হরিয়ানা(২) পাঞ্জাব(১) মহারাষ্ট্র(৩)	অন্ধ্র(৮) কেরল (৬)
	মাথা পিছু কম আয়	মধ্য প্রদেশ(১১) জম্মু-কাশ্মীর	বিহার(১৪) আসাম(১১) ওড়িশা(১৩) রাজস্থান(৯) পশ্চিমবঙ্গ(১০)

সারণী ৫.৩

(কোটি টাকায়)

বছর	কেন্দ্র ও রাজ্যের মোট রাজস্ব আদায়	কেন্দ্রের রাজস্ব আদায় পরিমান	মোট রাজস্বের শতাংশ	রাজ্যের রাজস্ব আদায় পরিমাণ	মোট রাজস্বের শতাংশ
১৯৭৪-৭৫	৯২০২.৩২	৬৩২১.৭৫	৬৮.৭০	২৮৮০.৫৭	৩১.২০
১৯৭৫-৭৬	১১১৬৪.৫১	৭৬০৮.৭৮	৬৮.১৫	৩৫৫৫.৭৩	৩১.৮৫
১৯৭৬-৭৭	১২৩১৩.৪৯	৮২৭০.৮৪	৬৭.১৭	৪০৪২.৬৫	৩২.৮৩
১৯৭৭-৭৮	১৩২২১.৬৭	৮৯০৬.০৪	৬৭.৩৬	৪৩১৫.৬৩	৩২.৬৪
১৯৭৮-৭৯	১৫৪৯৫.৫	১০৫২৫.১	৬৭.৯২	৪৯৭০.৪	৩২.০৮
১৯৭৯-৮০	১৭৬৪২.৮	১১৯৭৩.৬	৬৭.৮৬	৫৬৬৯.২	৩২.১৪
১৯৮০-৮১	১৯৭৯৬.১	১৩১৭৯.৯	৬৬.৫৮	৬৬১৬.২	৩৩.৪২

সারণী৫.৪

রাজ্যগুলির রাজস্ব আদায় ও ব্যয় (কোটি টাকায়)

বছর	রাজ্যের বাজস্বজাত আয়	রাজ্যের রাজস্বজাত ব্যয়	ব্যয় জনিত ঘাটতি
১৯৭৪-৭৫	২৮৮১	৬০৩৭	
১৯৭৫-৭৬	৩৫৫৬	৬৯৬৭	
১৯৭৬-৭৭	৪০৪৩	৭৯৪০	
১৯৭৭-৭৮	৪৩১৬	৮৯১২	
১৯৭৮-৭৯	৪৯৭১	১০৫১১	
১৯৭৯-৮০	৫৬৬৯	১২০৮১	
১৯৮০-৮১	৬৬১৬	১৪৮০৮	

সূত্র: রিজার্ভ ব্যাংক বুলেটিন

রিপোর্ট অন কারেন্সী অ্যান্ড ফিনান্স

সারণী ৫.৫

(কোটি টাকায়)

বছর	কেন্দ্র ও রাজ্যের মোট রাজস্বগত ব্যয়	কেন্দ্রের রাজস্বগত ব্যয়		রাজ্য সমূহের রাজস্বগত ব্যয়	
		পরিমাণ	মোট ব্যায়ের (শতাংশ)	পরিমাণ	মোট ব্যয়ের (শতাংশ)
১৯৭৪-৭৫	১০৮০০	৪৭৩৩	৪৩.৮২	৬০.৩৭	৫৬.১৮
১৯৭৫-৭৬				৭৯৪০	
১৯৭৭-৭৮	১৬৩১৪	৭৪০২	৪৫.৩৭	৮৯১২	৫৪.৬৩
১৯৭৮-৭৯	১৮৮২৪	৮৩১৩	৪৪.১৬	১০৫৬১	৫৫.৮৪
১৯৭৯-৮০	২১৭০৪	৯৬২৩	৪৪.৩৩	১২০৮১	৫৫.৬৭
১৯৮০-৮১	২৬৫৫৫	১১৭৪৭	৪৪.২৩	১৪৮০৮	৫৫.৭৭

সূত্র: রিজার্ভ ব্যাংক বুলেটিন, রিপোর্ট অন কারেন্সী অ্যান্ড ফিনান্স

সারণী ৫.৬

কমিশনগুলির সম্পদ বন্টন ও রাজ্যগুলির আর্থিক অবস্থার চুম্বক

(কোটি টাকায়)

কমিশন	কমিশন বণ্টিত সম্পদ	কমিশন অনুমিত রাজ্যগুলির বাজেটঘাটতি	প্রকৃত বাজেট (-) বা উদ্বৃত্ত (+)	রাজ্যগুলির মোট ঋণ	কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্যগুলির ঋণ	রাজ্যগুলি থেকে কেন্দ্রে ঋণজাত সুদ প্রাপ্তি
প্রথম	৪৯১.৬১	-১৪.০৫	-৪৬৬.৩২	১৪৮৫.০৩	১০৯৪.৯১	-
দ্বিতীয়	১০৪৮.৯৭	-৩৬.৭০	+১২৮.৩০	৩১৪৭.৬৫	২৩১৪.২৪	-
তৃতীয়	১৩১০.৭৬	-৬১.০০	+৩১৩.১৫	৫৫১১.৭৮	৪০৯৪.৬৩	৪৫৫
চতুর্থ	১৭৪৫.০২	-১৭৩.৭২	-১৪৮.৬৮	৭৪৪০.০০	৫৫৬৯.০০	৬২৫
পঞ্চম	৫৩১৫.৯৯	৬৩২.৯৫	-৩০৪.২৫	১১৫৮০.০০	৮৫৭৯.০০	১৬৬০
ষষ্ঠ	৯৬০৮.৮৫	-৩৩৩.৪৫	+৩৯৯১.৬০	১৯১৩৯.০০	১৩৮৯০.০০	২৫১৩
সপ্তম	২০৮৪২.৯৭	+১২৪০৯.১৯	-৩৬০০.০০	২৪২৫৪.০০		

সূত্র: (১) অর্থ কমিশনগুলির রিপোর্ট

(২) রিপোর্ট অন কারেন্সী অ্যান্ড ফিনান্স।

পুতুল-নাট্যশিল্প ও ইতিকর্তব্য

শ্রী রণজিৎ কুমার সমাদ্দার

'নাচায় পুতুল যথা দক্ষ বাজীকরে'—এই বাজীকরদের সমস্যা, পুতুল-শিল্প ও সনাতনী পুতুলতত্ত্ব নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ পুতুল নাট্যসংঘের একদিনের রাজ্য সম্মেলন হয়ে গেল নদিয়া জেলার পুতুল-গাঁও বগুলায়। বগুলা উচ্চবিদ্যালয়ে ২১. ৭. ৮৪ তারিখে বেলা একটা থেকে সুরু হয় সম্মেলন। এতে নদিয়াসহ বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা থেকে ৪৪ টি দলের প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছেন। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ক্যালকাটা পাপেট থিয়েটারের পরিচালক, ভারতীয় পুতলি-সংঘের (ইউনিমা ইন্ডিয়া) সহ.সভাপতি ও পুতুল-তাত্ত্বিক সুরেশ দত্ত মহাশয় এবং সি. পি. টি'র পক্ষে শ্রীমতী শম্পা ঘোষ ও রথীন ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও স্থানীয় পুতুল নাট্যদলের বহুকর্মী, সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। বর্তমান প্রতিবেদক ছিলেন এই সম্মেলনের উদ্বোধক এবং সুরেশ দত্ত মহাশয় ছিলেন প্রধান অতিথি। পুতুল নিয়ে তত্ত্বগত আলোচনা, সমস্যা ও পরিস্থিতি নিয়ে ইতিকর্তব্য নির্ধারণ ও জোটবদ্ধতা হলো এই সম্মেলনের ইতিবাচক-উপার্জন।

পুতুল ঃ তত্ত্বগত দিক/নাচ বনাম নাটক

পুতুল নাচ নয়, এখন যা হয় তা বরং বলা চলে পুতুল-নাটক বা পাপেট। ফরাসী 'পোপি' বা ল্যাটিন 'পুপা' থেকে পাপেট শব্দটির উৎপত্তি। একদা বাঙলার গ্রামগঞ্জে যে পুতুল নাচের আসর বসতো তাতে তার দৃশ্যসজ্জা, শিল্প-প্রকরণে যে সুষম-রূপটির অভাব থাকতো এখন আর সেরকমটি হয় না। পুতুলের আঙ্গিক বদল হয়েছে। এটি এখন বিশেষ শিল্পকলা বলে বিবেচিত। ধ্বনি সংযোগ, স্বর নিক্ষেপণ, আলো-মঞ্চ সবই এখন গুরুত্ব পেয়ে থাকে পুতুল-নাটকে। একসময় বাঁশের মাথায় পুতুল বসিয়ে তাকে পেটের সঙ্গে কাপড় দিয়ে বেঁধে হাতের কুশলীটানে পুতুলের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুলিয়ে দর্শকদের আনন্দ দেওয়া হতো। এই লাঠি-পুতুল (রড-পাপেটের) চলই বেশি ছিল। এবং রামায়ণ, মহাভারত কিংবা পুরাণের কাহিনী নিয়ে পুতুল নাচানো হতো। একই শিল্পী স্ত্রী-পুরুষের কণ্ঠে পর্দার আড়ালে সুর জুড়তেন। এখন অবশ্য শিল্পটি অনেকখানি দৃষ্টি নন্দন ও সুশ্রাব্য করে তোলা হয়েছে। আবার বিষয় নির্বাচনেও বৈচিত্র্য এসেছে। যাত্রা বা জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের অনুকরণে পুতুল-অভিনয়ের দৃশ্যান্তর ঘটে। এখন পুতুল সুতোয় বাঁধা 'ম্যারিওনেট' খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। 'ম্যারিওনেট' শব্দটি মা-মেরীর নাম থেকে উদ্ভূত। ইউরোপে ক্রিসমাসের সময় পুতুল নাচিয়েরা মা-মেরীর জীবনী অবলম্বন করে পুতুল নিয়ে অভিনয় দেখাতেন। মনে হয় সেই থেকেই এই নাটকের এমনই নামায়ণ, উৎসার ও প্রসার। নদিয়া জেলায় ম্যারিওনেট পুতুল নাচের চল বেশি। ম্যারিওনেট পুতুলের বিভিন্ন অংশ থাকে সুতোয় বাঁধা। পরিচালকেরা ওপর থেকে সুতো-দুলনির মাধ্যমে পুতুল খেলা দেখান। বর্তমানে শুধুমাত্র বাঙলায় নয় ভারতের বিভিন্নস্থানে রড, গ্লাভস্, ম্যারিওনেট ও স্যাডো পাপেটের প্রচলন দেখা যায়। গ্লাভস্ ও রড পাপেট ব্যবহার হয়ে থাকে নিচ থেকে। সুরেশ দত্ত মহাশয় জানিয়েছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষতঃ রাশিয়ায় রড পাপেটের প্রচলন বেশি। মস্কো স্টেট সেনট্রাল পাপেট মিউজিয়মে রড পাপেটের বিভাগে প্রথমেই রয়েছে ভারতের স্থান। রাশিয়ার পাপেট শিল্পী ইভানড প্রথম রড পাপেটের ব্যবহার করেন শেকস্পীয়ারের একটা নাটকে। (দ্র, আজকাল, ১৫.১১.৮১)। গ্লাভস্ পাপেট হাতে পরে নিতে হয়। পুতুলের অগ্রভাগ থাকে তর্জনী বা মধ্যমার ওপর। এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠ আঙুলে পুতুলের হাতের কাজ চলে। ভারতীয় পাপেটের সব থেকে প্রাচীন হলো স্যাডো-পাপেট। সামনে টাঙানো পর্দার পেছনে জ্বলতে থাকে প্রদীপ। প্রদীপ ও পর্দার মধ্যে বসে খেলা দেখান শিল্পী।

এখানে বলা যেতে পারে যে, পাশ্চাত্যের অনুকরণে পুতুলনাচ থেকে যেমন পুতুল নাটক বা পাপেটে তার উত্তরণ হয়েছে, তবে মনে রাখা দরকার এর শিল্পগত দিকটিকে আরো সমুজ্জ্বল করে তুলতে হবে কি আঙ্গিকে, কি কলা-কৌশলে। বিদেশে পুতুল নাটক লোকশিক্ষার অঙ্গস্বরূপ। শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে ও এসব নাটকের বিষয় নির্বাচনে সুষ্ঠ সুন্দর। আমাদের দেশে প্রথা বর্হিভূত শিক্ষার (Non-formal education) অঙ্গ স্বরূপ পুতুল নাটককে ব্যবহার করতে পারি। সামাজিক আচার-আচরণ, নীতিশিক্ষা এমনকি যৌনশিক্ষার প্রতীকিরণে পুতুল নাটক ব্যবহার করা যায়। তাই নিছক কাঠ পুতুল-পুতলির নাচ বদলে শুধুমাত্র বিনোদন নয়, শিক্ষার ও বাহন হোক পুতুল নাটক বা পাপেট। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মঞ্চে যখন মানুষ ও পুতুলের সহ অবস্থান হয় তখন হয়ে ওঠে মাপেট। জাপানে এ ধরনের অনুষ্ঠান দেখা যায়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মানুষের পুতুল অভিনয় আমাদের দেশেও প্রচলন ছিল। এখনও তার প্রমাণ মেলে। এই বাঙলায় অনেক স্থানে রাসের সময় বা পালা পার্বণে মানুষের পুতুল সাজা ও অভিনয় দেখতে পাওয়া যায়। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর এবং নদিয়ায় শান্তিপুরে এর পরিচয় মেলে।

সম্মেলন ঃ প্রতিনিধিদের ভাষ্য

পুতুল নাট্যসংঘের রাজ্য সম্মেলন উদ্বোধন হলো শিশু শিল্পী মহাদেব মন্ডলের লোকসঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। এটি অভিনব। তারপর স্বাগত ভাষণ দিলেন সংস্থার প্রাণপুরুষ সুশান্ত হালদার। তিনি জানালেন, নদিয়া জেলায় আছে ১০০ টি পুতুল নাচের দল এবং এতে প্রায় দশ হাজার মানুষের জীবিকা নির্বাহ হয়। এর মধ্যে বেশির ভাগ দলই হাঁসখালি ব্লকের। তিনি পুতুল নাট্যসংস্থা সমূহের হরেক সমস্যার কথা জানালেন। বিভিন্ন দলের মধ্যেঐকমত্য নেই। হতাশা, অবিশ্বাস থেকে দলগুলির ভাঙন আসছে। তাই দ্রুত হাতবদল হচ্ছে দলগুলির। বহুপূর্বেই প্রয়োজন ছিল একটি যৌথ সংস্থার। তাই, আমরা এই নাট্যসংঘকে নিবন্ধীভুক্ত করেছি ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩। (নং S/42587 of '83-84) এতে নিজেরা বাঁচবো, পরকে বাঁচাবো। সবার সঙ্গে মিলেমিশে, সকলের সহযোগিতা নিয়ে কোমর বেঁধে নেমে পড়লাম পশ্চিমবঙ্গ পুতুল নাট্যসংঘ গড়ার জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ পুতুল নাট্যসংঘের সাধারণ সম্পাদক অমর কৃষ্ণ দাস তথ্য সংস্কৃতি বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে উপেক্ষিত ও মুমূর্ষু ঐতিহ্যসম্পন্ন পুতুলনাচ শিল্পের উন্নয়ন ও সংশ্লিষ্ট লোকশিল্পীদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণকল্পে প্রেরিত ১৩ দফা দাবি সম্বলিত স্মারক পত্রটি পাঠ করেন। সমাগত শ্রোতৃ মন্ডলীর কাছে সংস্থা গঠনতন্ত্র সম্পর্কেও বিশদ বললেন তিনি। এমন একটি জরুরী সংস্থা গঠিত হলো বলে ক্যালকাটা পাপেট থিয়েটারের সদস্যা শ্রীমতী শম্পা ঘোষ সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানালেন। এবং এই সঙ্গে কর্মমন্ডলীকে অনুরোধ করলেন যেন বাঙলার অন্যান্য পুতুল নাট্য সংস্থা সমূহকে এর সঙ্গে যুক্ত করে নেওয়া হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে গোলকঠাকুর, মণীন্দ্রসরকার, মদন নন্দী এবং হরেন্দ্র কুমার রায় এই লোকশিল্পের নানা অসুবিধার কথা তুলে ধরেন এবং এই গ্রামীণ শিল্পটিকে বাঁচিয়ে তোলার আহ্বান জানান

পুতুল শিল্প-গবেষক এবং মস্কোর স্টেট সেনট্রাল পাপেট থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা সেরগেই ও ব্রাজৎসোফ-এর শিষ্য সুরেশ দত্ত মহাশয় ক্ষোভের সঙ্গে বললেন; পুতুল নাচের দল কিনে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চালালে পুতুল দল হয় বটে তাতে তো শিল্প বাঁচেনা। পুতুল নাচিয়েকে নাচ জানতে হবে, গান

জানতে হবে, মাইম বুঝতে হবে। তবেই দল শিল্পগুণে সমৃদ্ধ হবে। পুতুল নাট্যে থাকে 'ম্যাজিক' আর 'পোয়েম'—এসবই দলকে জানতে হবে, শিখতে হবে। পুতুল মানুষের মনে দাগ কাটতে পারে, গভীর কথা বলতে পারে। পুতুল নাচ এমন একটি মাধ্যম যেখানে সিনেমা থিয়েটার যেতে পারে না, সেখানে পুতুল নাচ যেতে পারে। শ্রী দত্ত মনে করেন, সকলে মিলে দানা বাঁধলে এই শিল্পের উপকার হবে। শুধুমাত্র সরকারি আনুকূল্যের ওপর নির্ভর করা ঠিক নয়। অর্থের জন্য শীতকালে সহযোগিতা ভিত্তিক যদি 'পাপেট-শো' দেওয়া যায়, তাহলে অর্থ সংগৃহীত হতে পারে। পুতুল নাটককে আমরা শিল্পতত্ত্ব হিসাবে চিন্তা করি না। এ দিয়ে শহরের সঙ্গে গ্রামের মেলবন্ধন করা যায়। আমরা ছোট ছোট ইউনিট হিসাবে গড়ে উঠতে পারি। বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে যেতে পারি। পাবলিসিটির ব্যবস্থা নিতে হবে। শুধুমাত্র বিনোদনের জন্য নয়, দেশগড়ার কাজেও পুতুল নাটকের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। রাশিয়ার পুতুল নাট্যসংস্থা সমূহ এসব কাজে যথার্থ অগ্রণী। এখানে বড়ো অভাব স্থায়ী মঞ্চের। এরজন্য আমরা চেষ্টা করতে পারি। শুধুমাত্র ম্যারিওনেট নয় রড পাপেট, স্যাডো বা গ্লাভস্ পাপেট দেখানোর উপযোগী মঞ্চ দরকার। আর, ভাষার মাধ্যম হিসাবে অন্তত হিন্দি শিখে নিলে রাজ্যের বাইরে পুতুল নাটকের দল নিয়ে যাওয়া যায়। শিল্পের আঙ্গিকে পশ্চিমবঙ্গের পুতুল নাটকের দল অনেক উন্নত। অথচ রাজ্যের বাইরে তার কদর ঘটছে না। এর কারণ আমরা অন্য ভাষা জানিনা। তাই এর রূপান্তর দরকার।

সমস্যা ঃ ইতিকর্তব্য

রাজ্য সম্মেলনে পুতুল নাট্য সংস্থা সমূহের সমস্যা আলোচিত হয়। এবং সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি জোর দেওয়া হয়। যথা:

এক বাংলার ঐতিহ্যসম্পন্ন পুতুলনাচকে সরকারের পক্ষ থেকে লোকসংস্কৃতির যথাযথ মর্যাদা ও তার সংরক্ষণের ব্যবস্থাদি করতে হবে। পুতুলনাচের সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের উৎসাহদান ও আর্থিক সহযোগিতা, উচ্চমান কলাকৌশল শিক্ষণের ব্যবস্থা এবং শিল্পের জন্য গবেষণা প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে।

দুই. পুরুলিয়ার ছৌনাচের মতই এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সরকারি আনুকূল্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা নিতে হবে। সর্বভারতীয়, রাজ্য ও আঞ্চলিক প্রদর্শনের জন্য পুতুল নাট্যোৎসবের উদ্যোগ সরকারকে নিতে হবে।

তিন. পুতুলনাচ পরিচালনের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়মনীতির পুনর্বিন্যাস দাবি করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের কোনস্থানে পুতুলনাচ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হলে পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি/পৌরসভা, তহশীলদার, জে. এল. আর. ও থানা, সি. আই. এস. ডি. পি. ও এবং ফায়ার ব্রিগেড, এস. ডি. ও, ডি. এম-এর অনুমতি নিতে হয়। এখানে বক্তব্য হোল, অনাদৃত পুতুলনাচ কেবলমাত্র গ্রামপঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা পৌরসভার কাছে অনুমতি নিয়ে অনুষ্ঠান করার অনুমতি দেওয়া হোক। এতে অহেতুক বিলম্ব ও ঝামেলা এড়ানো সম্ভব।

চার. পুতুল নাট্যশিল্পকে চুঙ্গিকর, প্রমোদকর ও বৃত্তিকর থেকে রেহাই দেওয়া হোক।

পাঁচ. অভাবগ্রস্ত পুতুলনাচ সংস্থাগুলিকে সরকারি অনুদান দিতে হবে। সেইসঙ্গে প্রতি বৎসর মরশুমের সময় লোকসানী পুতুল নাচ সংস্থাগুলির জন্য সরকারি ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। এবং পুতুল নাচ শিল্পী পরিবারে বেকার সমস্যার সমাধানকল্পে সারাবৎসর পুতুল নাচ প্রদর্শনী করার জন্য অ-মরশুমে (বর্ষাকালে) সরকার নিয়ন্ত্রিত জেলার হলগুলিতে (যেমন, রবীন্দ্রসদন) পুতুলনাচ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে।

এইসব উত্তম প্রস্তাবগুলি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রেরিত হয়েছে বটে, তবে এদিনের সম্মেলন ছিল সনাতনী গ্রামীণ পুতুল নাচ দলের সম্মেলন। কিন্তু দলগুলির অনুষ্ঠান এখন কতটা সনাতন? যখন ডিস্কো নাচ ও হিন্দি ছবির গান দিয়ে 'সিঁদুর নিওনা মুছে' অভিনয় হয়; তখন কতটা সনাতন থাকলো, সেদিকটা পুতুল নাট্যদলগুলিকেও ভেবে দেখতে হবে। পরির্তন ভালো। কিন্তু নিজস্ব সংস্কৃতির এ হেন রূপবদল ও রুচি বদল যখন মেনে নিই, তখন 'সনাতনী' শব্দটার বাগ্‌বিস্তার নাই বা করলাম।

তবুও ভালো। বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত,দলগুলি একতাবদ্ধ হচ্ছে, সংগঠিত হচ্ছে। এটাই আশার কথা। কারণ, একতাই বল, ঐক্যই শক্তি এ হল প্রাজ্ঞ-প্রবচন।

নারীসমাজ

যুগ যুগ ধরে মণীষীরা সমাজসংস্কারের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মেয়েদের জীবনে সুস্থিরতা সামাজিক মর্যাদা দিতে চেয়েছেন, গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষও বহু লড়াই বহু আন্দোলন করে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে নারীজাতিকে পুরুষের সমান মর্যাদা দেবার জন্য। মানুষ হিসাবে যোগ্য অধিকার ও মর্যাদা দেবার জন্য কিন্তু সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন না ঘটায় মেয়েদের জীবন-যাত্রার তেমন কোন হেরফের হয়নি। তাছাড়া সাবেকী আইনগুলোও বিরাট বাধা। এ প্রসঙ্গে বসিরহাট হিতৈষীর একটি অংশ তুলে ধরা হল

শরিয়তি আইন সংশোধন হোক

সম্প্রতি পুণার এক ভদ্রমহিলা বর্তমান শরিয়তি আইনের পরিবর্তন চেয়ে আদালতে এক আবেদন পেশ করে ভারতের লক্ষ লক্ষ মুশলিম বঞ্চিতা-লাঞ্ছিতা-নির্যাতিতা নারীর মুখপাত্রী হয়ে যে ভূমিকা নিয়েছেন তাহা অভিনন্দনযোগ্য। ধর্মের ধুয়া তুলে যে সমাজে পুরুষেরা বহু বিবাহ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নন বরং শরিয়তের দোহাই দিয়ে কত সহজে স্ত্রীকে তালাকও (বিবাহ বিচ্ছেদ) দেন। মুশলিম সমাজের তথাকথিত শিক্ষিত পুরুষরাও ধর্মের সুবাদে এই বিবেক বহির্ভূত কাজে যে অতিশয় আনুগত্য দেখান তার হাজার হাজার উদাহরণ আমাদের চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। এই ভাবে কত শত নারীর জীবন যৌবনেই শেষ হয়েছে ও হচ্ছে তার ইয়ত্ত্বা নেই। ওই সব লাঞ্ছিতা-বঞ্চিতা মুশলিম নারীর কাছে দেশের প্রচলিত আইন প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আইনের নামে মুশলিম নারীর উপর অন্যায় করে চলেছে তথাকথিত স্বার্থান্বেষী মুশলিম পুরুষ সমাজ।

একই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে দু'জন্য নারীর জন্য দুই রকম আইন প্রচলিত কেন? আইন করে যদি সতীদাহ প্রথা রদ করা যায় তাহলে বহু বিবাহ, তালাক কুপ্রথা বন্ধ হবে না কেন? সত্যের জন্য আমাদের অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে ইসলাম ধর্মের যখন প্রচলন হয় তখনকার সেই সময়ের সঙ্গে এখনকার সময়ের অনেক পার্থক্য ঘটেছে। শিক্ষা দীক্ষা চেতনা বোধশক্তির বহু গুণ ফারাক হয়েছে। বহুবিবাহ তথা তালাকপ্রথা মুশলিম নারী সমাজে অভিশাপ। এই নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে দেশের প্রতিটি প্রগতিশীল আত্মসচেতন মানুষের সাথে আমরাও বলি অবিলম্বে এই কুপ্রথা আইন করে বন্ধ করা হউক।

—বসিরহাট হিতৈষী-১০.৮.৮৪

পুস্তক পরিচয়

।। নির্বাচিত কবিতা ।।
।। চিমনি ।।
কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়
ন্যাশনাল পাবলিশার্স
২০৬, বিধান সরণি। কলি-৬
মূল্য: চৌদ্দ টাকা

বেশ কয়েক মাস আগে কবি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়ের 'চিমনি' (কবিতাটি) প্রকাশিত হয়। তার অল্পকাল পরেই তাঁর 'নির্বাচিত কবিতা' সংকলনটি প্রকাশিত হওয়ায় তাঁর গুণগ্রাহী বন্ধু ও পাঠক সমাজের অনেকেই তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

কবি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায় দুর্গাপুর-কারখানার একজন শ্রমিক-কবি। যে দুটো শক্ত পেশীবহুল হাত ও কব্জির জোরে লোহা-লক্কর ও যন্ত্রপাতি চালনা করেন, সেই হাতেই তিনি নিপুণভাবে লেখনী চালনা করে শ্রম ও শ্রমিকের জয়গান করে কবিতা রচনা করে চলেছেন। প্রগতিশীল শিবিরের খুবই পরিচিত নাম। ১৯৬০-এর দশক থেকেই তিনি কাব্য সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। প্রসঙ্গত এখানে আধুনিক কবিতার প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা আলোচনা করা যেতে পারে।

আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা, কুললক্ষণ এবং তার চরিত্রগুণ-বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নিয়ে আমাদের দেশেও কম তর্ক-বিতর্ক হয়নি। তবে আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানী ও ইতিহাসকারেরা আধুনিক যন্ত্রশিল্প ও যন্ত্রচালিত উৎপাদন ব্যবস্থাকেই আধুনিক যুগ ও সমাজ-সভ্যতার প্রধান উৎস ও চরিত্রগুণ-লক্ষণ বলে নির্দেশ করেছেন, যা পুঁজিবাদের বিকাশের অন্যতম প্রধান অবলম্বন ও সহায়ক হয়েছে। লক্ষণীয় ব্যাপার এই, বাংলাদেশে-বিশেষ করে বিগত পঞ্চাশের দশক হ'তে আধুনিক কবি এবং কবিতার প্লাবন সৃষ্টি হলেও তাঁদের কাব্যে যন্ত্র ও যন্ত্র-শিল্প সভ্যতার মহিমাগান তো দূরের কথা, তার অস্তিত্বের তেমন কোনো লক্ষণও খুঁজে পাওয়া যায় না। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে আস্থা এবং বিপ্লব ও মুক্তিসংগ্রামের মহিমাগান করে অনেক কমিউনিস্ট কবি আবেগ-উচ্ছ্বাসে ভরা কবিতা রচনা করেছেন, যার বেশ কিছু বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ভান্ডারে সার্থক ও স্থায়ী সম্পদের তালিকায় স্থান পাবে। কিন্তু সে-সব সৃষ্টির প্রধান উৎস ও প্রেরণা এসেছে বৌদ্ধিক উপলব্ধি থেকে, যার মধ্যে যেন 'নকল শৌখিন মজদুরি'র একটা আমেজ বা আভাস রয়েছে। তার অন্যতম প্রধান কারণ, আজও পর্যন্ত আমাদের দেশে তেমনভাবে যথার্থ শ্রমিক-কবির আবির্ভাব হয়নি। আধুনিক কবিতায় অনিবার্যভাবে দুটি প্রধান উপাদান ও অবলম্বন-লক্ষণ এসে যাবে: প্রথমত যন্ত্র ও যন্ত্রশিল্পের মহিমাগান; দ্বিতীয়ত, আধুনিক সমাজ ও সভ্যতার প্রধান রূপকার, শ্রমিক-শ্রেণীর সৃজন-শক্তির মহিমাগান। তবে যন্ত্রশক্তির মহিমা গান আর যন্ত্রপূজা এক কথা নয়। যন্ত্রপূজা স্বভাবতই 'machine-Fetishism' পরিণত হয় যার শেষ পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ রূপ নেয়।

ইউরোপে একদা 'ফিউচারিস্ট' (Futurist) কবিরা যন্ত্রের এবং যন্ত্রদানবের প্রচন্ড গতি ও শক্তির মহিমাগান গেয়ে কবিতা রচনা করেছিলেন; -যন্ত্রকে যারা চালনা করে সেই সব শ্রমজীবী মানুষেরা ছিলেন তাঁদের কাব্যে উপেক্ষিত। কিন্তু ফিউচারিজিমের জন্মভূমি ইতালিতে এই ফিউচারিস্ট কবিদের শেষ পরিণতি কি হয়েছিল, তা তো আমরা দেখেছি। যন্ত্রদানবের জয়গান গাইতে-গাইতে তারা শেষে যন্ত্রকে ছেড়ে দানবের-অর্থাৎ ফ্যাসিস্ট-পাশবিকতার মহিমা বা জয়গান গাইতে থাকেন। রুশ ফিউচারিস্ট কবিরা অবশ্য এতোখানি প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন না। স্বয়ং মায়কোভস্কি তাঁর যৌবনের সূচনাকালে সেখানকার ফিউচারিস্ট কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিভাবে তার প্রভাব কাটিয়ে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার শিবিরে তাঁর উত্তরণ ঘটেছিল, সে-ইতিহাস আজ অনেকেরই জানা। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, ফিউচারিজমের জন্মভূমি ছিল ইতালি। এই তত্ত্বের প্রধান রূপকার স্বয়ং মাত্তিনেত্তি (F.T. Matinette) তাঁর ঘোষণাপত্রের এক জায়গায় বললেন 'Ws shall extol the mounting tiumph of machine.' তিনি বললেন, 'A racing motor car is more beautiful than the statue of Nike Samothrace. রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মুক্তধারা' নাটকে এই যন্ত্রপূজারীদের ধ্যানমন্ত্রের অপূর্ব মূর্তিদান করেছেন, যন্ত্রপূজার গানে ('নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র')।

কবি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায় এই 'ফিউচারিস্ট'দের হ'তে শুধু ভিন্নই নয়, সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী কবি। তাঁর কবিতায় স্বাভাবিক-ভাবেই কারখানা, ফাউন্ড্রি, প্ল্যান্ট, মেশিন এসে গেছে; -কিন্তু তিনি মেশিনের নয়, Man behind the machine-এর জয়গান করেছেন। অবিরত সংগ্রাম-সংঘর্ষের রক্তপিচ্ছিল দীর্ঘ আঁকাবাঁকা পথে শ্রমিকের অভিযান অব্যাহত। কবি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায় সেই মহান সংগ্রামের এক অপরাজেয় সংগ্রামী সৈনিক-কবি। তাঁর সারা দেহে-সামনে, পিছনে আঘাতের চিহ্ন। তাঁর কাব্য-সাধনার সূচনাকাল থেকেই-বিশেষ করে বিগত '৭০'এর দশক থেকেই তাঁর কবিতাবলী দুর্গাপুরের রক্তাক্ত সংগ্রামের যেন দিনলিপি হয়ে গেছে। তাঁর 'নির্বাচিত কবিতা' সংকলন গ্রন্থে তার অনেকগুলিই সংকলিত হয়েছে। '৬০-এর দশকে একেবারে তাঁর গোড়ার দিকের কবিতায়ও এই শ্রেণী-চেতনার স্বাক্ষর রয়েছে। 'সেই একই দুপুর' কবিতার শেষ কয়টি চরণ মনে রাখার মত:

"আজ গ্রাইন্ডিং মেশিনে হাতের একটা আঙুল
ঘষা লেগে খয়ে গেছে। তাই বিছানায় শুয়ে আছি।
নীরবে যেমন থাকতাম অপেক্ষার প্রতিপলে
খুবই ব্যাকুল হয়ে।
ঠিক সেই একই দুপুর। শুধু ভৌগোলিক দূর
শুধু নিস্তব্ধতা ঘুঘুর গলায় আরো লম্বা হয়ে স্থির
রক্তের রংও তো এক
তাই প্রতিটা দিনের পরদিন আছড়ায় অস্তিত্বের সন্ধানে
ভাসায় প্লাবনে আমীর খাঁয়ের মারোয়ার সুর
অথচ একই সেই-সেই বুক জোড়া নিথর দুপুর।"

'সব পথ ঘুরে' কবিতাটি তাঁর প্রথম পর্বের একটি শ্রেষ্ঠ ও সার্থক রচনা। তার শেষ কয়টি চরণ:

"শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে পিঠেতে দেওয়াল
অতএব কোথায় উপায়
কোনো পথ খোলা নাই
তাই ভ্যান ত্রয়ের মতো সেই-
মানবিক চিন্তা-ভাবনায় প্রতিরোধ চাই
একমাত্র পথ এই
অকপটে বিশ্বাস আনো প্রচন্ড প্রলয়
ভাঙো
ভাঙো
ভেঙে আনো মৃত্যুঞ্জয়ী আলো রাঙিয়ে দিগন্ত"

'সমীপেষু' কবিতাটি ১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ৬ই আগষ্টের এবং 'ঘৃণা' কবিতাটি তার দুদিন পর ৮ই আগষ্টের ঘটনা উপলক্ষে রচিত। ১৯৭২ থেকে '৭৬-সেই

ভয়াবহ শ্বাস রোধকর সন্ত্রাসের দিনগুলিতে কবি কবিতায় দিনলিপি লিখে চলেছেন। "ক্ষমা নেই" কবিতায় তীব্র ঘৃণায় ও আক্রোশে দুই হাত তুলে কবি ধিক্কার জানিয়েছেন সেই নরপিশাচদেরঃ

হিটলারও পারেনি সন্ত্রাসে করতলে নাচাতে স্ব-কাল
এরাও অক্ষম হবে সেই কালের কাছেই
তাপমাত্রা বেড়ে জল বাষ্প হবে ঠিক
আত্মরক্ষা অসম্ভব, ক্ষমা নেই, কাকে ক্ষমা-
ধিক? তোকে ধিক?"

দুর্গাপুরে শ্রমিক-কর্মচারীদের বাঁচার দাবী-দাওয়া নিয়ে যে দীর্ঘ শ্রম-বিরোধ এবং সংগ্রাম-সংঘর্ষ চলে এসেছে, শ্রমিক-কবির রোজ-নামচায় তার অনেক ঘটনাই ধরা পড়েছে। 'নির্বাচিত কবিতা' সংকলনে তার কয়েকটিই স্থান পেয়েছে। 'চিমনি'-র তিনটি কবিতাও এদিক থেকে তাঁর সার্থক কবিতা। ইস্পাত ও দর্পণ এবং কবিতায় কর্তৃপক্ষের এবং কবিতায় কর্তৃপক্ষের এবং সুবিধাবাদী নেতৃত্বের উদ্দেশে তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও বিদ্রূপ উদ্গীরিত হয়েছে:

"স্যার অনেক তো দিন চলে গেল
স্বপ্নে বিভোর যুবক বেলা এবং কতো জ্যোৎস্না রাত
যা বলেছেন তাই করেছি ফাউন্ড্রির গোবর মাটি
কোক-ওভেনের কয়লা মেখে ভূত হয়েছি
মেল্টিং শপে লোহা গলার দৃশ্য দেখে
আমার মতো শ্রমিক যারা তাদের না-কি বুক ভরেছে
নীল আকাশে ছড়িয়ে গেছে কতো খবর আকাশবাণীর।

স্যার অনেক তো দিন চলে গেল
আমাদেরই রক্তেঘামে জ্বলছে শুধু আপনাদেরই রঙিন বাতি
এখন শুনছি প্রোডাকশনের মাল জমেছে মার্কেট নেই
ইনগটেরই মধ্যে বেজায় ঘুণ ধরেছে উড়ছে মাছি
গো-গ্রাসে খেয়ে ফেলছে একসেল-হুইল যা-পাচ্ছে
ঠন্ঠনা-ঠন্ ঝাড় লন্ঠন জ্বলছে বাতি।
স্যার চুলে এখন পাক ধরেছে আর কতো কাল ফাস্সি-ফিকির এবং কতো রুশ-ভারতী ভাঙিয়ে খাবেন ওঁ শান্তি
গালগল্পে পেট ভরেনা মনওনা চিচিংফাঁক দেখতে পাচ্ছি
TATA করে যাচ্ছে যারা তারাই আসছে ঘুরে-ফিরে
যাওয়া মানেই আবার আসা" ইত্যাদি।

কখনো বলে, 'প্রোডাকষনের মাল কমেছে মার্কেট নেই' আবার তার ,কিছুদিন পরই 'উৎপাদনের লক্ষ্য-সীমায় পৌছতে না-পারার জন্য কর্তৃপক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীদের দায়ী করে। কর্তৃপক্ষের এই শয়তানীর মুখোস খুলে ধরে কবি তাঁর 'দিল্লীর মসনদ' কবিতায় লিখলেন:

"এখন আমরা সকলে সাফ-সুফ বুঝে ফেলেছি
কারখানার কিছুই আমাদের হাতে দেয়নি মালিক সাহাব
হররোজ উৎপাদনের সব রেকর্ড নস্যাৎ করে
গোপন চক্রান্তে তসবিরে ঢালিস কালি
তবু আমরা এরকম গায়ে পড়ে আলোচনায় গেছি
এবং বিক্ষোভ হরতাল করে সাফ্-সুফ্ সমঝ-গিয়া
এদের কাছে আমরা বিদেশী।

*

ভাই লোগ্
কোথায় কি ফুল ফোটালে বাগানের শোভা বাড়ে
তা আমরা যত-ই জানি দিল্লীর মসনদ্ বেহদ গুস্তাখী।"

ভাব আঙিগক বা রচনা-শৈলীর দিকে তো বটেই; তাছাড়া কবিতার বিষয়বস্তু, উপাদান এবং শব্দ-নির্বাচনে শ্রমিক-কবির স্বীয় বিশিষ্টতা লক্ষণীয় এবং সত্যই প্রশংসনীয়।

আমরা এই শ্রমিক-কবির আরও পরিণত রচনার অপেক্ষায় রইলাম।

নেপাল মজুমদার

দুঃখী দেবতার আত্মচরিত-অভিজিৎ ঘোষ। প্রকাশক ইয়ং রাইটার্স। ১৬০ মানিকতলা মেইন রোড, কলিকাতা-৫৪। প্রকাশকাল বৈশাখ ১৩৯১। মূল্য-দশ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত একটি পরিচ্ছন্ন কবিতার বই। দামী কাগজে সুন্দর প্রচ্ছদ আর অলংকরণে একটি ছিমছাম গ্রন্থ।

নামকরণ থেকেই একটা বৈপরীত্যের ধাক্কা সমস্ত গ্রন্থ জুড়ে বিরাজমান। দেবতার কি আত্মচরিত হয়? যে দেবতা দুঃখী হতে পারে তার পক্ষে হয়ত সবই সম্ভব। যে কবির ভূমিকায় আছে "আমার আকাঙক্ষাগুলো ফুটে উঠছে একরাশ নানা রঙের ফুলে। এই কটি কথা লিখতে লিখতেই ফুরালো দিন।" তার দৃষ্টির বিষণ্ণ মধুরতায় সবই সম্ভব।

চর্তুদিকে দিনকাল দ্রুত বদলে যাচ্ছে। মানুষের সামনে এখন বাঁচার প্রশ্নই বড় হয়ে উঠেছে, জীবিকা তার অবসর অবকাশকে খণ্ড বিচ্ছিন্ন এবং নিশ্চিহ্ন করার দিকে দ্রুত টেনে নিয়ে চলেছে। এর মধ্যেই কিছু মানুষ প্রেম প্রণয় অন্তর্দাহ শোক আর্তি ও হতাশাকে নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় এবং তাকে যথা সম্ভব মোহময় করেই। আলোচ্য কবি সেই ধরনের মানুষ। বাইরের নানা ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যেও এই কবি তাঁর স্পর্শকাতর মন নিয়ে অসংখ্য কবিতার জাল বুনে যান। "বহুদিন থেকে তার কেউ নেই, চেতনার ভিতরে একাকী। সে ফুটে আছে অন্ধজীবনে। একটি সাদা মল্লিকা ফুল।" এই কবির মাথায় আছে কেবল " ছিন্ন কবিতার এক দুরন্ত ট্রাফিক।" ভয়াবহ একাকীত্বের এক বিরাট যন্ত্রণা তার।

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের বড় গুণ হচ্ছে, কবিতাগুলো দুর্বোধ্য নয়। একটা সাবলীল গতি, একটা আবেগময় অনুভব পাঠককে এই দ্বন্দ্ব-সংক্ষুব্ধ কোলাহল এবং উত্তেজনা থেকে একান্তে নিয়ে যেতে চায়। অনুশীলন পরিশীলনের মধ্য দিয়ে কবি নিজের শিল্প ভাবনাকে নানা কবিতার মধ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতেই ব্যস্ত। সেজন্য এই গ্রন্থের বিশেষ কোন কবিতা নয়, সব কবিতা জুড়েই কবি তার শিল্প ভাবনা প্রকাশের মাধুর্যে নিজের মুক্তির সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন। তার চিন্তা কল্পনার মধ্য দিয়ে তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশই এই কাব্যের বড় গুণ। কবির আত্মপ্রকাশই মুখ্য।

গ্রন্থসজ্জায় ও নতুনত্ব লক্ষণীয়। আর পাঁচটি গ্রন্থের মত এখানে কবিতার সূচী নেই, আছে কবিতার প্রথম পংক্তি সূচী, তারও পৃষ্ঠা সংখ্যা নেই।

সরোজমোহন মিত্র।

ডায়মন্ডহারবারে শান্তি মিছিল

সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য গত ৫ নভেম্বর ১২ জুলাই কমিটি, গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ এবং বিভিন্ন গণসংগঠনের সদস্যরা ডায়মন্ডহারবারে এক শান্তি মিছিলে পথ পরিক্রমা করেন। প্রায় তিন শতাধিক ব্যক্তি এই শান্তি মিছিলে যোগ দেন। এই শান্তি মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন পৌরসভার সভাপতি শ্রী অসিত বসু, সহ সভাপতি শ্রী মিলন দত্ত, অধ্যাপক শ্রী হরিদাস গুণ, অধ্যাপক শ্রী লক্ষ্মী ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রী গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী, জেলা পরিসদের সদস্য শ্রী শংকরী-প্রসাদ মন্ডল এবং গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের রাজ্য সদস্য শ্রী রবি চক্রবর্তী। ডায়মন্ডহারবার শহর পরিক্রমা করার পর শান্তি মিছিল ডায়মন্ডহারবার স্টেশনে একটি সভায় মিলিত হয়। ঐ সভায় বিভিন্ন বক্তা সাম্প্রদায়িক ঐক্য বজায় রাখার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানান।

১৯৭৬-৭৭ সাল থেকে ১৯৮৩-৮৪ সালের হিসেব দেখুন। আয়কর, কোম্পানী কর ও অন্তঃশুল্ক বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ থেকে এই সাত বছরে ৮,২০০ কোটি টাকা রাজস্ব সংগ্রহ করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ ফেরৎ পেয়েছে মাত্র ১৯০০ কোটি টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

অষ্টম অর্থ কমিশন বলেছিলেন এ-বছর কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে ১,৫০০ কোটি টাকা রাজ্যগুলিকে দেওয়া হোক। বলেছিলেন পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া হোক ৩২৫ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় সরকার সেই কথা শোনেন নি। পশ্চিমবঙ্গ তার প্রাপ্য ৩২৫ কোটি টাকা পায়নি, পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নের কাজ তবুও চলছে, চলবে।

—*পশ্চিমবঙ্গ সরকার*

বিবিধ সংবাদ

জাতীয় সংহতি অটুট রাখতে গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনাসম্পন্ন মহিলাদের মিছিল

'হিন্দু শিখ ভাই ভাই, দাঙ্গা নয় শান্তি চাই'-এই শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে ৪টি বামপন্থী মহিলা সংগঠন ১০ নভেম্বর ৮৪ তারিখে পথ পরিক্রমা করতে পথে নামলেন। ৪টি বামপন্থী দল হল: পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি, অগ্রগামী মহিলা সমিতি এবং নিখিলবঙ্গ মহিলা সংঘ। ৪টি সংগঠনের আহ্বানে মিছিলটি গড়িয়াহাট মোড় থেকে যাত্রা শুরু করে, দেশপ্রিয় পার্ক, রাসবিহারী এভিনিউ, সদানন্দ রোড, হরিশ মুখার্জি রোড ধরে মিছিলটি রবীন্দ্র সদনের সামনে যাত্রা শেষ করে।

মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী মঞ্জরী গুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সভানেত্রী ও রাজ্য সভার সদস্য শ্রীমতী কনক মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী শ্যামলী গুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির বীণা গুহ, শ্রীমতী বিদ্যা মুন্সী, নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘের শ্রীমতী গীতা সেনগুপ্ত, অগ্রগামী মহিলা সমিতির শ্রীমতী অপরাজিতা গোপ্পী। বহু শিখ মহিলা নির্দ্বিধায় মিছিলে অংশ গ্রহণ করেন।

মিছিল শুরু করার আগে রাজ্য সভার সদস্য শ্রীমতী কনক মুখোপাধ্যায় তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে মিছিলের মূল উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব জনগণের সামনে তুলে ধরেন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, দেশের সংকটজনক পরিস্থিতিতেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐক্য বজায় রাখতে গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা সম্পন্ন মহিলারা গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে এসেছেন আজও সেই অতীত ঐতিহ্যকে স্মরণে রেখে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে জাতীয় সংহতি ও ঐক্য গড়ে তোলার কাজে এগিয়ে যেতে হবে।

ঐক্য গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে, মুহুর্মুহু ধ্বনি ওঠে, 'হিন্দু শিখ ভাই ভাই, দাঙ্গা নয় শান্তি চাই' 'ভারত বাসীয়ো কো আখো কে তারা, রাষ্ট্রীয় একতা সবকা পিয়ারা' 'বিচ্ছিন্নতাবাদ হো বরবাদ, হম সব এক হ্যায়', 'সাম্রাজ্য বাদী চক্রান্ত ধ্বংস হোক।' রাসবিহারী এভিনিউতে গুরুদ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে শিখ ভাই-বোনদের প্রতি সম্প্রীতি জ্ঞাপন করা হয়। দু'পাশ থেকে শতসহস্র মানুষ উন্মুখ হয়ে দেখেন মিছিলটি, দৃপ্ত ভঙ্গিমায় যে মিছিলটি এগিয়ে চলে,-রবীন্দ্র সদনের সামনে এসে দৃঢ় শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

নিয়মিত ট্রেন চলাচলের দাবিতে ডেপুটেশন

কলকাতাঃ শিয়ালদহ সেকশনে নিয়মিত ট্রেন চলাচল সহ সাত-দফা দাবিতে এ ডি আর এম-এর কাছে এক ডেপুটেশন দেওয়া হয় ২১ অক্টোবর।

শিয়ালদহ যাত্রী স্বার্থ ও নিরাপত্তা রক্ষা কমিটির উদ্যোগে এই ডেপুটেশনে ১০ জন প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁরা সময়মতো ট্রেন চলাচল, ট্রেনের কোচ বৃদ্ধি, কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমে নিয়োগ; স্টেশন চত্বরে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ, নতুন ট্রেন চালু করার নামে অন্য ট্রেন থেকে 'বগি' কেটে নেওয়া বন্ধ এবং চালু ট্রেন বাতিল করা চলবে না বলে দাবি জানান।

প্রতিনিধিরা ট্রেন দুর্ঘটনার জন্য এবং যাত্রী সাধারণের হয়রানির জন্য কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার তীব্র সমালোচনা করেন। অন্যান্য সমস্যার কথাও তাঁরা উল্লেখ করেন এবং এই সব সমস্যা সমাধানে রেল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রতিনিধিরা বলেন, ট্রেন যাত্রীদের দুর্ভোগ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। যাত্রীরা ধৈর্য হারাচ্ছেন। এই অবস্থায় কর্তৃপক্ষের সচেতন হওয়া প্রয়োজন বলে প্রতিনিধিরা অভিমত প্রকাশ করেন।

ডেপুটেশন যাঁরা দেন তাঁদের মধ্যে বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত দে, নাগরিক কমিটির প্রশান্ত চ্যাটার্জি, ১২ই জুলাই কমিটির ভবতোষ রায়, এ বি টি এ-র শ্রী ধর উপাধ্যায় এবং সি আই টি এউ-র নির্মল সেনগুপ্ত, আশুতোষ গুহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ডেপুটেশকারীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়ঃ এই দাবির সমর্থনে পরবর্তী সময়ে শিয়ালদহ স্টেশনে এক জমায়েত হবে।

সারকারিয়া কমিশনের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি

৪৩৩ পৃষ্ঠার পর

কোনো শাখার সঙ্গে কাজে নিজ মাতৃভাষা ব্যবহারের। নেপালী ভাষাকে অষ্টম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। নেপালী ভাষাকে জাতীয় ভাষার স্বীকৃতি দিলে পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমে বসবাসকারী বিরাট সংখ্যক নেপালীভাষী জনগণের প্রতি যোগ্য মর্যাদা দান করা হবে! আমি আশা করি, এই কমিশন এ সম্পর্কে সুপারিশ করবেন।

কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আর্থিক সম্পদের বন্টন-সম্পর্কিত প্রশ্নে শ্রী বসু বলেন; কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে কি অনুপাতে রাজস্ব বন্টন করা হবে তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব অর্থ কমিশনের হাতে থাকা উচিত নয়। কেন্দ্র কর্তৃক সংগৃহীত মোট টাকা থেকে প্রতিটি রাজ্য কি অনুপাতে পাবে, শুধু সেইটুকু স্থির করাই হবে অর্থ কমিশনের কাজ. ঐ টাকার পঁচাত্তর শতাংশ রাজ্যগুলিকে বরাদ্দ করতে হবে।

রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০০ ও ২০১ অনুচ্ছেদে রাজ্যপালকে ক্ষমতা দেওয়া আছে, বিধানসভায় গৃহীত বিলগুলি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করার-এই পদ্ধতি তুলে দিতে হবে। রাজ্যের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্য বিধানসভাকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে কেন্দ্রের কোনো হস্তক্ষেপ কোনো অজুহাতেই অনুমোদন করা হবে না।

কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সংবিধানের ৭৪ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ কমিশনের সুপারিশগুলি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন, কেননা এই ধারায় এখন রয়েছে রাষ্ট্রপতিকে তাঁর সমস্ত কাজকর্মে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরামর্শ মেনে চলতে হবে। আমি বলতে চাই, রাজ্যসরকারের অভিমত হল যেক্ষেত্রে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক জড়িত সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নয়, আন্তঃ রাজ্য পরিষদের পরামর্শ মেনেই চলতে হবে। যেকথা সংবিধানের ২৬৩ ধারায় বর্ণিত হয়েছে।

Advertisement No. 46/84.

APPLICATIONS are invited for undermentioned temporary posts in West Bengal Veterinary Service. Pay Rs.660-40-1100-50-1600/—. Total minimum emoluments : Rs. 1439.70.

N.B. (i) Selected candidates shall, prior to joining, produce a cretificate of registration with West Bengal Veterinary Council; (ii)[for (a), (b), (c), (d), (f) & (g)] Qualifications and experience relaxable at Commission's discretion for otherwise well-qualified candidates.

(a)	ASSISTANT BACTERIOLOGIST, BRUCELLOSIS CONTROL UNIT	Two
(b)	ASSISTANT BACTERIOLOGIST, INFECTIOUS ABORTION SCHEME	One (reserved for a S.C. Candidate, failing unreserved)
(c)	ASSISTANT PATHOLOGIST, BRUCELLOSIS CONTROL UNIT	Two (one reserved for for a S.T. candidate, failing unreserved)
(d)	ASSISTANT PATHOLOGIST, DISEASE INVESTIGATION CUM-CLINICAL LABORATORY	One
(e)	DISEASE INVESTIGATION OFFICER, HILL DISEASES	One
(f)	BIO-CHEMIST, DISEASE INVESTIGATION-CUM-CLINICAL LABORATORY	One
(g)	MYCOLOGIST, DISEASE INVESTIGATION-CUM-CLINICAL LABORATORY	One
(h)	TUBERCULOSIS CONTROL OFFICER	One (reserved for a S.C. Candidate, failing unreserved)
(i)	DISTRICT VETERINARY OFFICER	One

QUALIFICATIONS : [For (a) & (b)] Essential— (i) M.R.C.V.S. or M.V.Sc. (Bacteriology); Or Degree or diploma in Venterinary Science plus Post-graduate qualifications in Veterinary Bacteriology; (ii) Two Years' research experience in Bacterilogical work.

[for (c) & (d)] Essential— (i) M.R.C.V.S. or M.V.Sc. (Pathology); Or Degree or diploma in Veterinary Science plus Post-graduate qualifications in Veterinary Pathology; (ii) Two years' research experience in Pathological work.

[for (e)] Essential— (i) M.R.C.V.S. or M.Sc. (Veterinary Science) Or Degree or recognised diploma in Veterinary Science plus Post-graduate degree or diploma in Veterinary Pathology, Bacteriology and Parasitology or five years' experience inanimal disease investigation; (ii) Knowledge of Bengali—spoken and Written.

* Fee in crossed I.P.O. or T/Chalan for Rs. 5/- (Re. 1.25 for S.C. and S.T.) to be enclosed with applications duly filled in along with two self-addressed unstamped envelopes. Fee should in no case be enclosed with the letter requesting for applications forms.

* Indigent displaced persons and repatriates need not pay application fee provided necessary certificate, in original, is submitted in this regard.

CLOSING DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS DECEMBER 10, 1984. Candidates are required to fulfil the essential qualifications on this date at the latest.

Advertosement No. 47/84.

APPLICATIONS are invited for undementioned posts :

(a) SENIOR SCIENTIFIC OFFICER, BALLISTICS DIVISION, FORNSIC SCIENCE LABORATORY IN WEST BENGAL—GENERAL SERVICE- One permanent. Pay : Rs. 660-40-1100-50-1600/- plus special pay of Rs. 75/-per month. Total minimum emoluments Rs. 1425.70.

QUALIFICATIONS : Essential— Second class Master's degree in Physics/Mathematics or equivalent plus five years' experience Physics/Mathematics as one of the subjects or equivalent plus seven years' experience in Forensic Ballistics.

Age Ordinarily not more than 35 years on 1-1-84.

N.B. : Qualifications and age relaxable at Commission's discretion for otherwise well-qualified and experienced candidates.

(b) INSPECTOR OF DRUGS UNDER DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE IN WEST BENGAL GENERAL SERVICE— 51 temporary (likely to be permanent) (13 reserved for S.C. and 5 for S.T. candidates). Pay : Rs. 470-20-550-25-750-30-870-40-1230/-. Total minimum emoluments Rs. 1080.70.

N.B. Persons having any financial interest in manufacture, import or sale of drugs or consmetics are ineligible candidates should submit a declaration to this effect with application.

QUALIFICATIONS :Degree in Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Post-graduate degree in Chemistry with Pharmaceutics as a special subject; Or Diploma in Pharmaceutical Chemistry granted by the Pharmaceutical Society of Great Britain; Or Dgree in Medicine or Science having at least one year's Post-graduate training in a laboratory under (i) a Goverment Analyst appointed under the Drugs and Cosmetics Act, 1940, or (ii) a Chemical Examiner, or (iii) a Fellow of the Royal Institute of Chemistry of Great Britain (Branch E), or (iv) Head of an Institution specially approved for the purpose by the appointing authority. Age Ordinarily not more than 35 years on 1-1-84, relaxable for permanent Goverment servants and those possessing exceptinal qualifications.

* Where a number of years of experience is presvribed as an item of qualifications experience would mean only experience gained in full-time employment.

* Panels will also be prepared.

* Besides pay all posts carry allowances as admissible.

* Age concession for displaced persons, S.C. & S.T., physically handicapped persons, political sufferers and repatriates.

* For detailed particualrs and application forms, write to Secretary, Public Service Commission, West Bengal, Bhabani Bhawan, Alipore, Calcutta-7000027 with self-addressed envelope with postage stamp of 80p givingh name of post and Advt. No. or obtain personally from Commission's office. Time for collection and submission of application froms poersonally

* Fee in crossed I.P.O or T/Chalan for Rs. 5/- (Re.1.25 fro S.C. and S.T.) to be enclosed with application duly filled in along with two self-addressed unstamped envelopes. Fee should in no case be enclosed with the letter requesting for application forms.

* Indigent displaced persons and repatriates need not pay application fee provided necessary certificate, in original, is submitted in this regard.

CLOSING DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS : DECEMBER 20. 1984. Candidates are required to fulfil the essential qualifications on this date at the latest.

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল সংগ্রহকল্পে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত

বিরাট যাত্রানুষ্ঠান

১৬ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর ’৮৪

স্হান রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণ □ রবিবার ২ ও ৬-৩০ মিঃ

[গত সপ্তাহের সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে পূর্ণ অনুষ্ঠান সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। নিচে ২৩ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠান সূচি প্রকাশিত হল।]

২৩ নভেম্বর	লোকরঙ্গ	শার্দুল জারক খান	শ্রেঃ শিবদাস মুখার্জী, সঞ্চয়িতা চ্যাটার্জী
২৪ নভেম্বর	মুক্ত অঙ্গন যাত্রা সমাজ	কালো সিন্দুর	শ্রেঃ নিমুল মুখার্জী, মীনাকুমারী
২৫ নভেম্বর (দুপুর)	নট জাগরণী যাত্রা ইউনিট	নরক থেকে বলছি	শ্রেঃ প্রশান্তকুমার, স্নিগ্ধা চৌধুরী
২৫ নভেম্বর (সন্ধ্যা)	সত্যনারায়ণ অপেরা	সম্রাট হিরণ্যকশিপু	শ্রেঃ রাখাল সিংহ, সুজাতা বোস, রাজকুমার
২৬ নভেম্বর	নবরঞ্জন অপেরা	অগ্নিবাসরে প্রিয়া	শ্রেঃ তপনকুমার, মহুয়া চ্যাটার্জী, ঠাকুরদাস মিত্র,
২৭ নভেম্বর	শিল্পীতীর্থ	জয়া	শ্রেঃ কালিদাস গাঙ্গুলী, সঞ্চিতা মুখার্জী, কুমার ইন্দ্রনাথ
২৮ নভেম্বর	চন্দ্রলোক অপেরা	শচীমাতাগো	শ্রেঃ জ্যোৎস্না দত্ত, গুরুদাস ধাড়া
২৯ নভেম্বর	নাট্যতীর্থ	শের-ই-বাহাদুর শা	শ্রেঃ শেখর গাঙ্গুলী, শর্ম্মিষ্ঠা গাঙ্গুলী, প্রভাত গৌতম
৩০ নভেম্বর	লোকনাট্য	বিমাতা কৈকেয়ী	শ্রেঃ অশোককুমার, মীনাক্ষী দে, তিনু বন্দ্যোপাধ্যায়
১ ডিসেম্বর	গন্ধর্ব অপেরা	শকুন্তলা	শ্রেঃ পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ছন্দা চ্যাটার্জী,
২ ডিসেম্বর (দুপুর)	রাণার যাত্রা ইউনিট	কালবৈশাখী	শ্রেঃ অরুণ মুখার্জী, শ্যামলী ভট্টাচার্য, শ্রাবন্তী চ্যাটার্জী
২ ডিসেম্বর	তারা মা অপেরা	নিষ্কৃতি	শ্রেঃ উজ্জ্বল সেনগুপ্ত, কনকলতা, কাজল মুখার্জী
৩ ডিসেম্বর	গণবাণী	মহাজনের মেয়ে	শ্রেঃ নিরঞ্জন ঘোষ, লতা দেশাই, মণিমালা বোস
৪ ডিসেম্বর	নিউ প্রভাস অপেরা	বিন্দুর ছেলে	শ্রেঃ বর্ণালী ব্যানার্জী, শ্যামসুন্দর গোস্বামী, অনুপকুমার
৫ ডিসেম্বর	ভারতী অপেরা	হীরা ঝিলের কান্না	শ্রেঃ ইন্দ্র লাহিড়ী, লীনা চক্রবর্তী, গৌতম সাধুখাঁ
৬ ডিসেম্বর	মোহন অপেরা	দুর্গতিনাশিনী দুর্গা	শ্রেঃ দ্বিজু ভাওয়াল, মিতা চ্যাটার্জী, ভোলা পাল

সিজিন টিকিটঃ ৭৫ টাকা

দৈনিক টিকিটঃ ৩ টাকা, ৫ টাকা, ৭ টাকা

টিকিট প্রাপ্তিস্হান

রবীন্দ্রসদন ● অহীন্দ্র মঞ্চ □৩ বিজন থিয়েটার ● প্রিয়া সিনেমা

লোকরঞ্জন শাখা (এন্টালি জেম সিনেমার বিপরীতে) এবং রাইটার্স বিল্ডিংস ক্যান্টিন হল

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রিসিশন লিথোগ্রাফার্স ৫/৩, গ্রীণ পার্ক, কলিকাতা ৭০০ ০১৯ হইতে মুদ্রিত।